আনন্দমেলা

৩ জুন ১৯৮১

১.৫০

ঝরঝরে
তরতাজা
হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
লিনটাস-LR.28-203 BG
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আনন্দমেলা

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ • ৩ জুন ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ৪ সংখ্যা

ভ্রমণকাহিনী

আইওয়া নদীর ধারে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৪

গল্প

ধাঁধায় পড়লেন তেঁতুলমামা। হিমানীশ গোস্বামী ১০
অদৃশ্য হাত। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ২৪
সাহসী কাক। সুকুমার সিংহরায় ৫৫

উপন্যাস

হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৫
সিসের আঙটি। বিমল কর ৪৯

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ১৯

ছড়া

মজার ছড়া। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ২৭

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল। পি· কে· ৫২

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

লেখাপড়া

নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের প্রধান-শিক্ষক কী বলেন ৫৮
ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ৫৯
বাংলা বলো। বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো

ওয়েস্ট ইণ্ডিজই সেরা। অরিজিৎ সেন ৪২
বক্সিংয়ের বম্বার। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪৮
চীনা ভেলকি। চিরঞ্জীব ৪৭

অন্যান্য আকর্ষণ

ছবির মজা ১৮, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৭, আঁকো-শেখো ৬৬

ভিভিয়ান রিচার্ডসের পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪১

প্রচ্ছদ : বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাংপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশন্‌স (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেট্টা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আইওয়া নদীর ধারে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেপ্টেম্বর মাসে আইওয়া শহরকে মনে হবে, না জানি কোন মস্ত সাধুবাবার আশ্রম বুঝি। কী সবুজ, কী শান্ত। শহরের মধ্যিখানে বয়ে যাচ্ছে আইওয়া নদী। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। স্রোত বইছে কি বইছে না। মিষ্টি চেহারার রেড ইণ্ডিয়ান বালিকা যেন শহরে বেড়াতে এসেছে। মাথায় জড়ানো সবুজ স্কার্ফ, গলায় রঙবেরঙের পাথরের মালা।

হুঁ, রেড ইণ্ডিয়ান কথাটা এমনি-এমনি মাথায় আসেনি। "আইওয়া" শব্দটা ওই ভাষার। ছোট-ছোট টিলা আর ঢেউ-খেলানো-বিশাল তৃণভূমিতে দুশো বছর আগে ওরাই এখানে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে বেড়িয়েছে। একশো মাইল দূরে ডেভেন পোর্ট শহরের ধারে মিসিসিপি নদ থেকে আইওয়া অব্দি। আইওয়াকে দেখে চোখ বুজেই বুড়ো মিসিসিপির মেয়ে বলা যায়। নির্ভয়ে তার ছোট্ট বুকে খেলা করছে বুনো হাঁস আর

হ্যালউইন পরবে দেশবিদেশের সাহিত্যিক

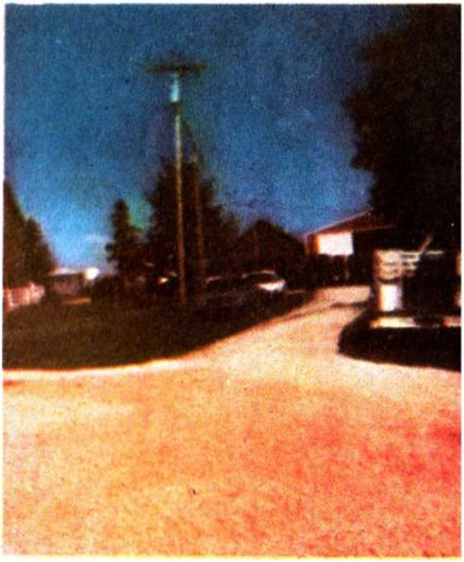

চাষিদের গ্রাম

আমাদের খুব চেনা মার্কিন রুইমাছ ঝাঁক।

একসময় এই শহরই ছিল আইওয়া রাজ্যের রাজধানী। পরে রাজধানী হল ডেময় শহরে। তখন আইওয়ার সব সরকারি বাড়িতে পত্তন হল বিশ্ববিদ্যালয়। এখন তো আইওয়া রীতিমতো বিশ্ববিদ্যালয়-নগরী। দেশবিদেশের ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকায় সরগরম। হঠাৎ-হঠাৎ আমাদের শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ে যায়। প্রতিদিনই দেশবিদেশের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী আর পণ্ডিতজনেরা এসে জুটছেন। জমিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। আলাপ-আলোচনা করছেন। গোমড়া-মুখো সভা নয়, এখানে সভা মানেই হাসির হুল্লোড়। বক্তা ও শ্রোতা কে কাকে বেকায়দায় ফেলতে পারে, তার টাগ-অব-ওয়ার। তাই দারুণ জমে ওঠে।

তেত্রিশটি দেশের কবি-সাহিত্যিক শোরগোল তুলে ঢুকেছিলুম এই বিশ্ববিদ্যালয়-নগরীতে। তখনও আইওয়া ছিল ঘন চিকন সবুজ। সে-সবুজের কী জেল্লা! ভিড়-ভাট্টা আদপে নেই। শুধু দুপুরবেলা ডাউন অর্থাৎ শহরের কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের তখন ক্লাসের বিরতি। দল বেঁধে রেস্তোরাঁ, কাফেটারিয়া বা স্টেক হাউসে খেতে যায়। তাই বলে হল্লাবাজি নয়। চোখ বুজলে খালি পায়ের শব্দ। চোখ খুললে

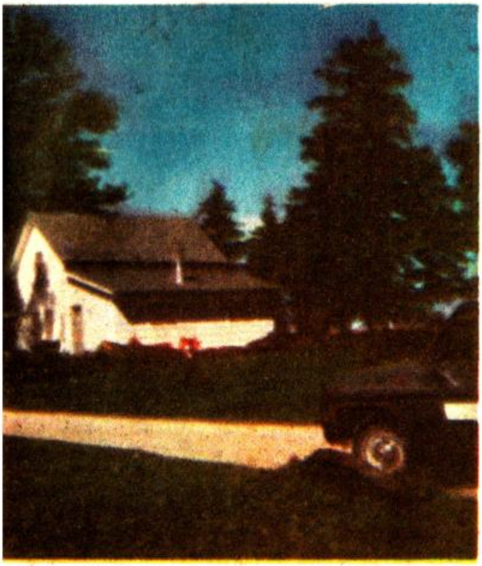

চাষিবাড়ির সামনে

রঙবেরঙের মানুষ। আর ওই সবুজ গাছ। গাছ আর গাছ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্রে তামাশা করে বলা হয়েছিল, "আইওয়া ইজ ফুল অব ট্রীজ। বৃক্ষনগরী বলতে পারো। এসে দেখবে অকুতোভয়ে বিচরণরত কাঠবেড়াল, দুএকটি অমলধবল খরগোশ, অসংখ্য পাখি। দুক্কুরবেলা শুনবে ঝিঁঝির অর্কেস্ট্রা। কিন্তু সাবধান! সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ফল অর্থাৎ পাতা ঝরার দিন শুরু। তারপরই দিনে-দিনে ঠাণ্ডা-হিম আবহাওয়া। নভেম্বরে আর বাইরে তিষ্ঠোতে পারবে না। অতএব সঙ্গে প্রচুর গরম পোশাক আনতে ভুলো না।

হয়তো এই গরমের দেশের লোকটাকে তাক লাগাতেই অক্টোবরে হঠাৎ একদিন বরফপড়া শুরু হয়েছিল। কস্মিনকালে এমন আজব কাণ্ড দেখিনি। ভোরবেলা থেকে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। বিকেলে জানলা দিয়ে দেখি, আরে এ কী! চারদিক সাদা। আকাশ ধূসর। আর সাদা মুরগির রোঁয়ার মতো হালকা ফুরফুরে বরফ পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। জমে উঠছে ঢালু লনের ঝাউঝোপ, রাস্তার ধারে খালের ওপর ঝুঁকে থাকা উইলো আর দীর্ঘ পপলার শ্রেণীর ওপর। তখনই জনহীন রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে ভুতুড়ে আলো জ্বলে উঠেছে। মার্কিন দেশটা, সাত্য বলতে কী, রাস্তা আর মোটর গাড়িব দেশ। সেদিন রাস্তায় তত বেশি গাড়িও দেখলুম না। শহরতলিতে বিশাল আটতলা যে বাড়িতে ছিলুম, তার নাম মে-ফ্লাওয়ার। নীচে রাস্তা। তার ওপারে পার্ক। পার্কের গা ঘেঁষে বইছে আইওয়া নদী। সব বরফে ঢেকে যাচ্ছে।

কিন্তু 'ফল' কী জিনিস, তার আগে দেখা হয়ে গেছে। প্রকৃতি যে এমন রঙের খেলা খেলে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। 'ফল' শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। রোদে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু কী কনকনে ঠাণ্ডা! রাগ হত, যখন আমাদের প্রোগ্রাম অফিসার এডইন একমুখ খুশি নিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে বলত, এ বিউটিফুল ওয়ার্ম ডে! ওয়ার্ম? বলে কী। ওই সময় চোখে পড়েছিল, পার্কের মেপল গাছটার পাতা উজ্জ্বল লাল হলুদ হয়ে গেছে কবে। পপলার আর এলম সারা গায়ে হলুদ মেখেছে। আইওয়া নদীর ওপারে এক বনভূমি। তার মাথা লালে লাল। তারপর লাল আলোয়ান ছড়ানো হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তারপর একদিন গেছি ঈগল মার্ট নামক খাদ্যভাণ্ডারে। বব গাড়ি আনবে, প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি, লাল হলুদ ঝরাপাতার পোশাক পরে

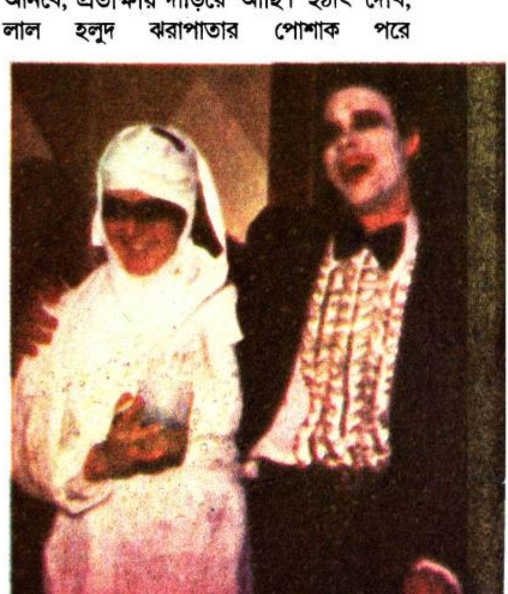

হ্যালউইন, ছদ্মবেশে

গাছ-গাছালির তলায় কারা যেন উদ্দাম ঘূর্ণিনাচ জুড়ে দিল। নাচতে-নাচতে একেবারে রাস্তায়। রাস্তা জুড়ে চলেছে রঙিন পোশাক পরা অদৃশ্য শয়ে-শয়ে নাচিয়ে। হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে মেরি বলল, "দেখছ তো? এই হচ্ছে ফলের এক খেলা।"

সেই ফলের মরসুমে ছুটিছাটার দিন আইওয়ার নদীতে ছিপ ফেলে একটা আস্ত মার্কিন রুই ধরে ফেললুম এবং তাক লাগিয়ে দিলুম সব্বাইকে। মাছ ধরার অনুমতি নিতে হয়। কিছু পয়সাকড়ি লাগে। কিন্তু আমার বরাত। কুকুরকে বেজায় ভয় পাই। একটা প্রকাণ্ড কেলে টেরিয়ার কোথ্‌থেকে এসে পেছনে গর্‌র্‌ করতেই উলটে পড়লুম একেবারে নদীর জলে। ঠাণ্ডা হিম জল। ওপরে কুকুরটা তখন ফিকফিক করে নিশ্চয় হাসছিল। দূর থেকে ব্যাপারটা দেখেছিলেন আফ্রিকান স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক পিটার। উনি তখন জগিং করেছিলেন। অর্থাৎ দৌড়নোর ব্যায়াম করছিলেন। কুকুরটাকে ধমক দিয়ে হটিয়ে আমাকে ওঠালেন। বনের

নদীর ওপারে নৃত্যনাট্য-ভবন

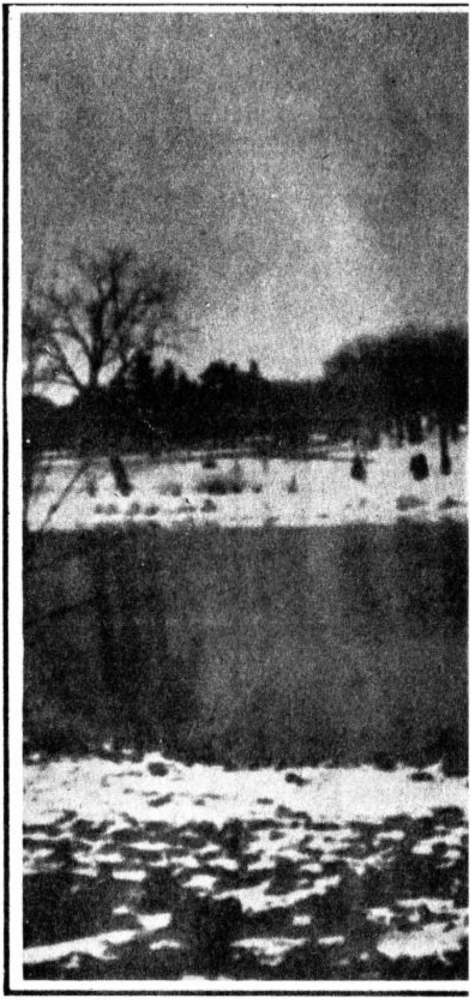

ডিসেম্বরে নদী, তীরে কঙ্কালসার গাছপালা

ভেতর থেকে প্রকাণ্ড মোরগের মতো এক ভদ্রলোক বেরিয়ে কাচু-মাচু মুখে বললেন, "জিম তত দুষ্টু নয়। নেহাত বিদেশী দেখে ওর একটু কৌতূহল হয়েছিল হয়তো। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ওর হয়ে।"

কুকুরের পাল্লায় আরেকদিন পড়েছিলুম। মিশরের কবি আবু সেন্নার সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিলুম। মাইলটাক দূরে কয়েকটা টিলা জুড়ে ঘন বন। বনের ভেতর একফালি রাস্তা, এবড়োখেবড়ো ধূসর পাথুরে মাটির। দুজনে

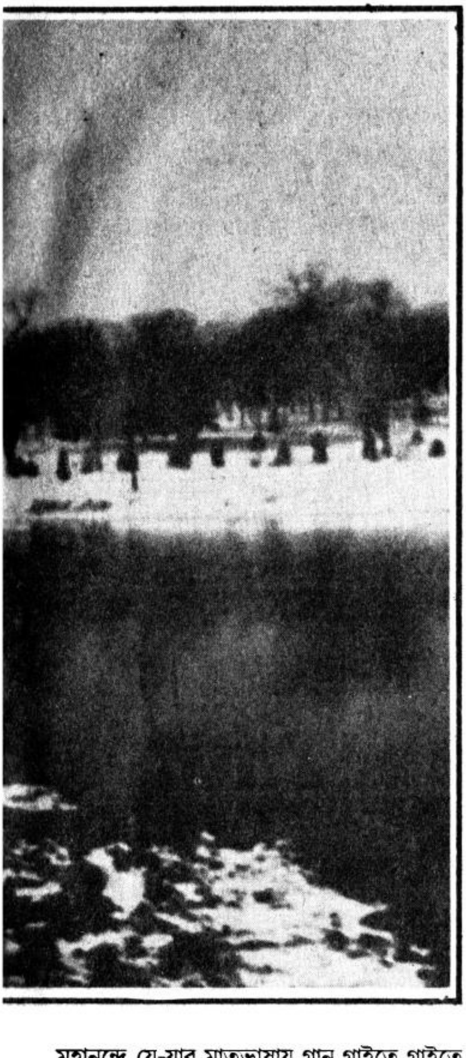

মহানন্দে যে-যার মাতৃভাষায় গান গাইতে গাইতে চলেছি। হঠাৎ কোথ্‌থেকে একটা বাদামি আর একটা সাদা কুকুর এসে আমাদের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে গজরানি শুরু করল। ভয়ে আমরা কাঠ। বুকে দুই ঠ্যাং তুলে দিতেই আবু সেন্না আরবি ভাষায় বিড়বিড় করে কী আওড়াতে থাকল। বুঝলুম, ধর্মগ্রন্থের আপৎকালীন মন্তরটা আওড়াচ্ছে। সেদিনও ভাগ্যিস এক জগিং-কারী দৈবাৎ এসে পড়ে উদ্ধার করল। আশ্চর্য, কুকুর দুটো তার কথা মেনে বনে গিয়ে ঢুকল। তাকিয়ে দেখি বনের ভেতর বাড়ি। ওরা তার প্রহরী। কিন্তু তাই বলে আমরা কি চোর না চোরের মাসতুতো ভাই? আবু সেন্নার রাগ আর পড়তে চায় না। ফেরার পথে সে বারবার বলে, এ দস্তুরমতো অপমান। আইওয়ার প্রায় সব বাড়িতেই দরজায় কেউ তালা দেয় না জানো? চোর নেবেটা কী? টাকাকড়ি থাকে ব্যাংকে। বাড়িতে খালি আসবাবপত্তর, কিছু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, জামাকাপড়, আর খাবারদাবার। এসব জিনিস নেবে না চোর। তাছাড়া মার্কিন দেশে আজকাল ছোট শহর এবং **কান্‌ট্রি** এলাকা অর্থাৎ গাঁ-গেরাম একেবারে নিরুপদ্রবে বাসযোগ্য জায়গা। গাঁ-গেরাম বলতে কয়েকটা চাষি-বাড়ি।

এরকম একটা চাষি-বাড়িতে এক রাত্তির কাটিয়েছিলুম। আইওয়া থেকে পঁচিশ মাইল দূরে খাঁ-খাঁ মাঠের মধ্যে বাড়িটা। এদিকে-ওদিকে শুকনো ভুট্টাখেত ধূসর বনের মতো। হাইওয়ে থেকে একটু দূরে। এমনিতেই নেহাত ডাউন-টাউন ছাড়া লোকজন চোখে পড়ে না কোথাও। ওখানে তো নিঝুমপুরী। চাষির নাম

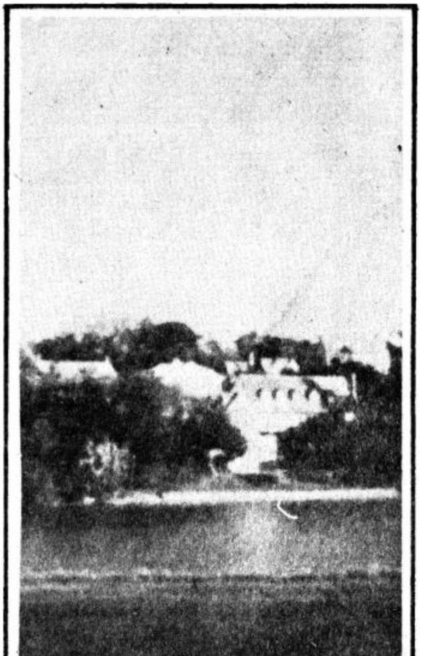

গাছে-ঢাকা আইওয়া শহর

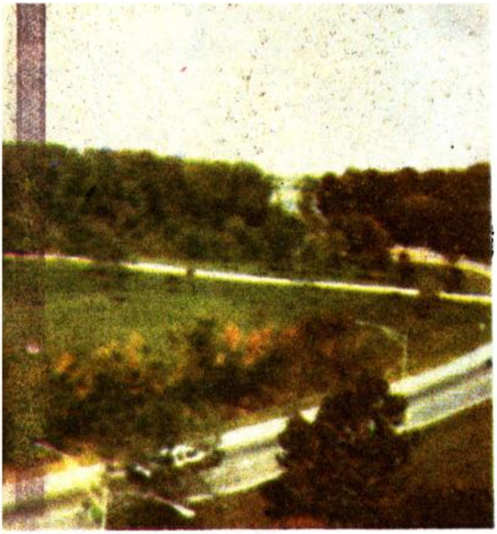

আইওয়ার পার্ক, সেপ্টেম্বরে

জনসন। বয়স বাহাত্তর। কিন্তু জগিং করেন দুবেলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মালয়ে যুদ্ধ করে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে। তাঁর গিন্নিও সুশিক্ষিতা। দুই ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে আইওয়ায় থাকে। কলেজের ছাত্রী। ছেলে দুটোর দশ এবং বারো বছর বয়স। হ্যাঁ, কুকুর আছে গোটা তিনেক। কিন্তু আমার দিকে তারা ঘুরেও তাকাল না। ক্রমে ক্রমে ভয় ভেঙে যেই একটার মাথায় হাত রেখেছি আমার মুখ চেটে দিল। ছ্যা, ছ্যা। বাথরুমে ঢুকলুম। ঢুকে তাক লেগে গেল। অন্য পাশে ল্যাট্রিনের মেঝে রঙিন পুরু কার্পেটে ঢাকা। দেয়াল জুড়ে ছবি। মাঠের বাড়ি শহরের তাবৎ আধুনিক সরঞ্জামে ভরা। সন্ধেবেলা বসার ঘরে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখা পর্যন্ত হয়ে গেল। রাতে খেতের টাটকা শাকসবজি আর মাংস দুধ খেতে-খেতে ভারতের গল্প শোনালুম। বাইরে তাপাঙ্ক চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কিন্তু ঘরে আরামদায়ক গরম। মধ্যরাতে পর্দা সরিয়ে কাচের জানলা দিয়ে দেখি, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সারা মাঠ। বুড়ো ওকগাছটা যেন হাতছানি দিয়ে বলছে, "আয়, রেডইণ্ডিয়ান সর্দার ওয়াকিমোর গপ্পো শোনাব। সে আমার ছায়ায় বসে দুঃখ করে বলেছিল, সাক্ষী থেকো বন্ধু। সাগরপারের বিদেশীরা এসে আমাদের সাতপুরুষের সুখের দুনিয়াটা কেড়ে নিল।" কিন্তু বুড়ো ওকের গপ্পো শুনতে গেলেই যে ঠাণ্ডায় জমে যাব।

পরে মে-ফ্লাওয়ারে আমার ঘরে টিভিতে সেন্টিনিয়েল নামে একটা ধারাবাহিক ম্যুভি দেখেছিলাম। আমেরিকায় প্রথম ইউরোপীয়দের আবির্ভাব এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ছবিটা। যে-বইয়ের কাহিনী থেকে এ-ছবি, সে-বইটার লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। বড় রোমাঞ্চকর কাহিনী। তিন পুরুষের নানা ঘটনায় জমজমাট।

তবে মজার কথা, আমাদের দেশের মতো সিনেমা-হলে কিন্তু ভিড়ই থাকে না। আইওয়ায় অনেকগুলো থিয়েটার অর্থাৎ ছবি দেখানোর ঘর আছে। ঢুকে দেখেছি খাঁ-খাঁ অবস্থা। কখনও বড়জোর জনাবিশেক দর্শক। লোকে ভিড় জমায় নৃত্যনাট্য, অপেরা আর গানের জলসায়। নদীর ধারে বিশাল অডিটোরিয়ামে কত বিচিত্র ব্যালে দেখেছি। কিন্তু সিনেমায় উৎসাহ কারুর নেই তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিজু' ভবনে রোজ পরীক্ষামূলক ম্যুভি দেখানো হয়। প্রচণ্ড ভিড় করে সবাই দেখে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়টাই বেশি। আইওয়া তো আসলে ওদেরই শহর। তাই বিনিপয়সায় পনেরো মিনিট অন্তর বাস চলে। নাম ক্যামবাস। পয়সা লাগে যে বাসে তাতে কিন্তু

গাছের পাতায় রঙ ধরেছে

যাত্রী খুব কম। ৩৫ সেণ্ট ভাড়া। শনিবার ২৫ সেণ্ট। রবিবার কিন্তু সব বাস বন্ধ। একদিনেই ভাব হয়ে যাবে ড্রাইভারের সঙ্গে। মেয়ে ড্রাইভারও আছে। এমন-কী বিশাল-বিশাল ট্রাকও চালায় মেয়েরা। আমাদের মে-ফ্লাওয়ারের তদারকি অফিসের সবাই মেয়ে। শহরের রেস্তোরাঁ-গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরাও ঠিকে কাজ করে। বাসনধোয়া কাজও। কখনও কোনো বাড়িতে দু ঘণ্টা লনের ঘাস ছাঁটাই করে ঘণ্টায় চার ডলার রোজগার মন্দ কী। কাজ করাটাই মর্যাদার ব্যাপার। কেউ চুপচাপ বসে থাকতে রাজি নয়। করার মতো কাজ না থাকলে বরং কিছুক্ষণ জগিং করে এসো মাইলটাক। সব সময় চঞ্চল থাকো, প্রাণবন্ত হও এবং হাসো। চার মাসে একটাও গোমড়ামুখো মানুষ দেখিনি। দুবার মুখ-দেখাদেখি হতেই 'হাই' সম্ভাষণ মনকে ভরিয়ে তোলে খুশিতে। মামুলি ভদ্রতা বলবে? কিন্তু তাই বা মন্দ কী? বিশেষ করে দোকানে গিয়ে সেলসবয় বা সেলসগার্ল কিংবা আপিসে গিয়ে কোনো কর্মীকে যখন একমুখ হাসি নিয়ে বলতে শুনেছি, ক্যান আই হেলপ ইউ স্যার, এবং চলে আসার সময় হ্যাভ এ নাইস ডে, তখন মনে খুশির হাওয়া বয়ে যায়।

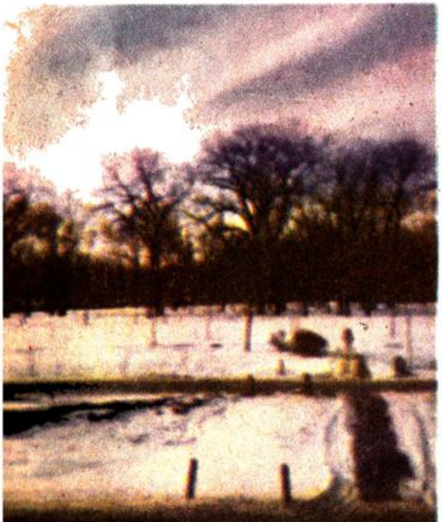

রঙ ফতুর. এখন শীতকাল

পাতা ঝরার ঠিক আগে

আইওয়াতে বিদেশীরা কতটা আপন হয়ে ওঠে ওদের, টের পেয়েছিলুম অক্টোবরে হ্যালউইন পরবের রাতে। এ এক মজার পরব। যে-যার খুশিমতো ছদ্মবেশ পরে বা রঙচঙ মাখে। এডইন আর মারিয়া তো ড্রাকুলা আর মড়া সেজে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। রাতে বাড়ি-বাড়ি হ্যালউইন পার্টির নেমন্তন্ন। ওই বেশে নাচগান। আমরাও বিকট সেজেছিলুম রঙ মেখে এবং মুখোশ পরে। রাতভর ঠাণ্ডার মধ্যে বাড়ি-বাড়ি হানা দিয়েছিলুম।

তার চেয়েও বড় কথা এখানকার মানুষরা বেজায় আলাপী। গায়ে পড়ে আলাপে ওদের জুড়ি নেই। আর কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর প্রতি ওদের আগ্রহও প্রচণ্ড। আইওয়ার রাম-শ্যাম-যদু-মধুও দেখা হলে আমাকে মিষ্টি হেসে বলেছে, কিছু লিখছ কি এখন? আইওয়া নিয়ে লেখো না বাবু। জানতুম আইওয়া ওদের বড় প্রিয় শহর।

কিন্তু ডিসেম্বরে আইওয়া যখন বরফে সাদা হতে থাকল, তাপাঙ্ক নামল শূন্য ডিগ্রীর নীচে তেরোতে এবং চারদিকে গাছপালা কঙ্কাল হয়ে গেল, তখন বেজায় রেগে ঠিক করে ফেললুম, হ্যাত্তেরি। এ ভূতের দেশে কি মানুষ থাকে? আসার দিন প্লেন থেকে মনে হচ্ছিল, উত্তরমেরু পেরুচ্ছি।

ধাঁধায় পড়লেন তেঁতুলমামা

হিমানীশ গোস্বামী

তেঁতুলমামা বললেন, "আমি পরাজিত। উঃ আমি পরাজিত। অর্থাৎ কিনা বুঝলে সামু, আমি অপরাজিত নই!"

দুঃখিত মুখে সামু এসে দাঁড়াল তেঁতুলমামার কাছে। বলল, "আজ হচ্ছে চিলি-চিকেনের দিন, সঙ্গে রুমাল-রুটি, আর সামন মাছ দিয়ে তৈরি চমৎকার স্যালাড। এমন দিনে মন খারাপ করতে নেই।"

"ঠিক কথা। মন খারাপ করব না। কিন্তু, কিন্তু মন খারাপ যে হয়েই চলেছে। উঃ, সৌম্য আমাকে প্যাঁচে ফেলেছে যা একখানা। ওকে আমি দুষ্টু ছেলে বলেই জানতাম, কিন্তু সে যে এত দুষ্টু হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।"

"আপনার সামনে একখানা খোলা চিঠি দেখে মনে হচ্ছে সৌমুবাবু আপনাকে একটা চিঠি লিখে বেকায়দায় ফেলেছে।"

"ঠিক তাই সামু, ঠিক তাই। আর চিঠিতে যা লিখেছে তাতে আমার এক রাত তো ঘুম হবেই না, তারপর আর খাওয়ার ইচ্ছেও থাকে না।"

সামু বলল, "আপনার কাছে যদি এই চিঠি মোটে না আসত তাহলে আপনার তো এত মনঃকষ্ট হত না।"

"তা ঠিক।"

"তাহলে আমি একটা পরামর্শ দিই, আপনি শুনুন। আজ হল গিয়ে শনিবার। কিন্তু ধরুন আজ রবিবার।"

"আজ রবিবার ধরব? কেন?" তেঁতুলমামার ডবল প্রশ্ন।

"কেননা, রবিবারে ডাক বিলি হয় না। আর ডাক বিলি না হলে চিঠিও আসে না, আর চিঠি আসে না মানেই হল তার সঙ্গেকার যে দুশ্চিন্তা সেটাও থাকে না। চিঠিটাকে বন্ধ করে আপনি ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখুন। ও-চিঠি দুদিন পরে খুললেও চলবে।"

এমন সময় আলসের ঘুম ভাঙল। আলসের ঘুম ভাঙার পর সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভৌ-ভৌ করে ডাকল। আর হাওয়া শুঁকল জিভ বার করে। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে মুখে করে একটা কলকে নিয়ে এল। সামু কলকে নিয়ে তাতে কাঠকয়লা দিয়ে একটু তামাক দিয়ে আগুন ধরিয়ে গড়গড়ায় বসিয়ে দিল, আর আলসে গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে ফর্‌ফর্‌র্‌র্‌ করে টানতে লাগল।

পুরনো কথার খেই ধরে তেঁতুলমামা

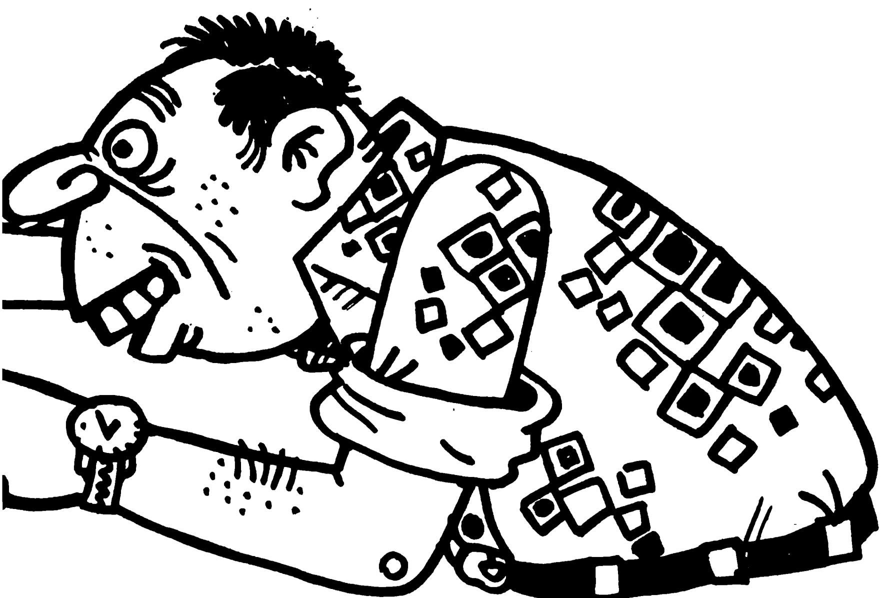

বললেন, "কথাটা ঠিক। আমি যদি চিঠিটা না পেতাম তাহলে ধাঁধায় পড়তে হত না। আর সে কী ধাঁধা—বিচ্ছিরি রকমের সব ধাঁধা। কেবল খুব দুষ্ট প্রকৃতির গুণ্ডাদের মাথা থেকেই তা বেরুতে পারে। উঃ, এমন ধাঁধা পাঠিয়েছে যার উত্তর আমার মাথায় আসছে না!"

সামু বলল, "আঃ, আপনি তো চিঠি পানইনি। তাহলে ধাঁধা আসছে কোত্থেকে?"

"ঠিক কথা," তেঁতুলমামা বললেন, "কথাটা ঠিকই বলেছ তুমি। তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি। বড় হলে তুমি একটা হোমড়া-চোমরা হয়েও যেতে পারো। কিন্তু ধাঁধাগুলো যে ছাই মন থেকে যাচ্ছেই না!"

"যাবে যাবে," সামু বলল, "আপনি একটু ধৈর্য ধরুন, তাহলেই যাবে। মানে আপনি অন্য চিন্তা কিছু করুন।"

"অন্নচিন্তা? আমার অন্নচিন্তার দরকার কী?"

"অন্নচিন্তা আপনি করবেন কেন, বালাই ষাট!" সামু বলল, "আমি অন্নচিন্তার কথা বলিনি, বলেছি অন্য চিন্তা।"

"ও তাই বলো। অন্য চিন্তা। কথাটা ঠিক বলেছ। কিন্তু অন্য কোনো রকম চিন্তাই আসছে না। কেবলি ধাঁধার কথা মনে আসছে।"

সামু দীর্ঘ সময় ধরে ভাবল। বলল, "তাহলে আর উপায় নেই—ঐ ধাঁধা, সে যে-রকম ধাঁধাই হোক, তার সমাধান করতেই হবে। একটা ধাঁধা বলুন তো?"

তেঁতুলমামা বললেন, "সৌম্য কী রকম দুষ্ট দেখ। প্রথম ধাঁধা লিখেছে, একটা ঘরে চারজন পড়াশুনো করছিল একটা গোল টেবিলে। ঘরে জ্বলছিল একশো পাওয়ারের বাল্‌ব। এখন আরও চারজন এসে ঐ একই টেবিলে বসে পড়তে শুরু করল—প্রশ্ন, এখন প্রথম চারজন যতখানি আলো পাচ্ছিল ততখানি আলো পেতে হলে ঐ ঘরে কত পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বালতে হবে?"

সামু বলল, "হুঁ বিদ্‌ঘুটে প্রশ্নই বটে। ভীষণ বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন। এখন দেখতে হবে আলোটা কোথায় ছিল?"

"ঠিক কথা," তেঁতুলমামা বললেন, "আলোটা কোথায় ছিল সেটা সৌম্য লেখেনি। ওকে একটা তার করে জেনে নাও।"

সামু বলল, "আলো ধরে নিতে হবে টেবিলের উপরেই ছিল। একটা গোল-টেবিলের কথা যখন লিখেছে সৌমুবাবু তখন গোল নেই। ঐ গোল-টেবিলেরই মাঝখানে আলো বসাতে হবে।"

"ঠিক আছে। বসালাম আলো গোল টেবিলের মাঝখানেই—টেবিল ল্যাম্প। এখন যে আলোয় চারজন পড়ছিল, সেই আলোয় আটজন পড়তে গেলে আলো ভাগাভাগি হয়ে

ডেট কেক ব্যবহার করুন, সাদাকে আপন করুন

আজ, আগের থেকেও বেশী
লোক ডেট কেকের
দারুণ ধোয়া পছন্দ করছেন;
ওঁরা বলেন, এটি যেমন
চোখ ধাঁধানো সাদা করে,
তেমনি অনেক বেশী
সাশ্রয়ও পড়ে।

ডেট কেক

Shilpi-DM-41 A/80 Ben.

গেল। মানে, ডবল আলোর দরকার। অর্থাৎ একশো পাওয়ারের বাল্‌বের বদলে দরকার হবে দুশো পাওয়ারের বাল্‌ব। তাই না?"

সামু মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে এ তো জলের মতো পরিষ্কার।"

তেঁতুলমামা বললেন, "তাহলে তো কোনো গোলই ছিল না। ধাঁধাটা এত সহজ হলে তো রাম-শ্যাম-যদু-মধু সকলেই উত্তরটা দিয়ে দিতে পারে। তাহলে সৌম্য কেন আমাকে কষ্ট করে খরচ করে, খামে করে, চিঠি পাঠাল? নিশ্চয় ব্যাপারটায় আরও কোনো প্যাঁচ আছে। আমি ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখব। একটা গোল-টেবিল দরকার।"

সামু বলল, "একটা গোল-টেবিল কিনতে বেশ খরচা হয়ে যাবে।"

তেঁতুলমামা বললেন, "নিলাম থেকে কিনে নেব একটা। তবে বড় গোল-টেবিল দরকার। তার চারদিকে আটজনকে বসাতে হবে তো। টেবিল ল্যাম্প আছে, কোনো অসুবিধে নেই। তবে একটা ঝামেলাও আছে।"

"কী রকম?"

"একশো পাওয়ারের বাল্‌ব কেনা যায় কেননা বাজারে পাওয়া যায়, কিন্তু দুশো পাওয়ারের বাল্‌ব তো দেখি না।"

সামু বলল, "তাতে কী হয়েছে। একশো পাওয়ারের দুটো বাল্‌ব জ্বাললেই হবে।"

তেঁতুলমামা বললেন, "হ্যাঁ ঠিক বলেছ। কাল রবিবার। কালই একবার চৌরঙ্গিতে নিলামের দোকানে যেতে হবে। এই ধাঁধার উত্তর বার করা দরকার।"

সামু বলল, "তাতে কম খরচ পড়বে না। পাঁচ-ছশো টাকার কমে আজকাল ভাল টেবিল পাওয়াই যায় না।"

"তা বটে। অত টাকা কেবল একটা ধাঁধার উত্তরের জন্য খরচ করা কি উচিত? তাহলে আর-একটা কাজ করলে হয়—টেবিল কিনে এনে ধাঁধার উত্তর বার করে আবার টেবিলটাকে বিক্রি করে দেওয়া যায়।"

সামু বলল, "আমাদের তাহলে টেবিল কে কিনবে তা বার করবার জন্য অনেক ঝামেলায় পড়তে হবে। দুম করে তো বড় একটা টেবিল বিক্রি করা যাবে না।"

"তা না যাক," তেঁতুলমামা বললেন, "ক্ষতি নেই। আমাদের না হয় একটা বড় গোল-টেবিল রয়ে গেল। আলসেকে না হয় শুতে দেব তাতে।"

আলসের নাম করতেই বোধ হয় আলসে তামাক টানা ছেড়ে দিয়ে এসে তেঁতুলমামার কাছে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। তেঁতুলমামা বললেন, "হ্যাঁ, আমরা ধাঁধার উত্তর বার করবই।"

সামু বলল, "এরপরে আর ধাঁধা আছে?"

তেঁতুলমামা বললেন, "নেই? সৌম্য কি একটা ধাঁধায় ফেলেই ছেড়ে দেবে নাকি? এর পরেরটা খুবই ঘোলাটে এবং গোলমেলে।"

"কী রকম?"

তেঁতুলমামা বললেন, "সৌম্য লিখেছে, একজন লোক পুরো এক গেলাস দুধ খেতে গিয়ে দেখে তাতে তিনটে ছোট আরসোলা মরে পড়ে আছে। লোকটি ঘৃণায় সমস্ত দুধ বেসিনে ফেলে দিল। পর দিন সেই একই লোক একই গেলাস থেকে দুধ খেতে গিয়ে দেখল, আগেকার দিনের আরসোলার ডবল সাইজের, কিন্তু মাত্র একটা আরসোলা দুধে মরে রয়েছে। তখন সে ঘৃণায় কতখানি দুধ বেসিনে ফেলে দেবে!"

সামু বলল, "পড়ুন তো আবার। ঠিক মাথায় ঢুকল না সব।"

তেঁতুলমামা পড়ে শোনালেন আবার।

সামু বলল, "ধাঁধা বটে! এর মধ্যে গোলমাল অনেক। লোকটা খুব অসাবধান, আর নোংরা।"

তেঁতুলমামা বললেন, "আর কিছু?"

সামু বলল, "লোকটার পয়সাকড়ি আছে—রোজ দুধ খায়। তা ছাড়া লোকটা অসুস্থ হলেও আমি আশ্চর্য হব না!"

তেঁতুলমামা বললেন, "কেন আশ্চর্য হবে না তুমি?"

সামু বলল, "হয়ত লোকটার পয়সা নেই। বেচারাকে হয়ত ডাক্তার রোজ দুধ খেতে বলেছে—সে কোনোক্রমে পয়সা যোগাড় করে দুধ কেনে। কিন্তু নোংরা বাড়িতে থাকে, নইলে অত আরসোলা হয় কেমন করে?"

তেঁতুলমামা বললেন "কিন্তু অত সব কথার দরকার কী? উত্তরটা তো বার করতে হবে।"

সামু বলল, "এ হিসেব তো সোজা। তিনটে

আরসোলা থাকায় সবটা দুধ ফেলে দিয়েছে—লোকটা। একটা আরসোলায় সে ফেলবে দুধের এক তৃতীয়াংশ। তবে ধাঁধার মধ্যে একটা কৌশল করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দ্বিতীয় দিনের আরসোলার আকার প্রথম দিনের আরসোলার দ্বিগুণ। তাহলে প্রকারান্তরে বলা হচ্ছে, দ্বিতীয় দিনের আরসোলা একটা হলেও আসলে ওটাকে দুধে দেখে দুটো আরসোলার মতোই ঘৃণা হবে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, এক-তৃতীয়াংশ দুধ রেখে লোকটা দুই-তৃতীয়াংশ দুধ ফেলে দেবে। ভারী শক্ত ব্যাপার ঐ রকম দুধ ফেলা। ঠিক হিসেবমতো ফেলা খুবই দুষ্কর। পারাই যায় না বলতে গেলে, তবে অঙ্কের লোকেরা ঐ সব করতে পারে।"

"কিন্তু," তেঁতুলমামা বললেন, "আরও একটা হিসেব এর মধ্যে আমরা বাদ দিচ্ছি নাকি?"

সামু বলল, "কীরকম?"

তেঁতুলমামা বললেন, "প্রথম দিনে দুধে ছিল তিনটে আরসোলা। তিনটে মৃত আরসোলা। অর্থাৎ তিনটে মৃতদেহ। দ্বিতীয় দিনে গেলাসে ছিল একটা মৃতদেহ। সে হিসেবে দুধ ফেলবে এক-তৃতীয়াংশ। বাকিটা সে খাবে।"

সামু বলল, "উঁহু খাবে না।"

তেঁতুলমামা বললেন, "আলবত খাবে। অঙ্কের হিসাবমতো সে খেতে বাধ্য।"

সামু বলল, "লোকটার যদি কোনো বুদ্ধি থাকে তাহলে সে ঐ গেলাস থেকে আধ ফোঁটা দুধও খাবে না।"

তেঁতুলমামা বললেন, "তাই তো—তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে দেখছি। লোকটির বুদ্ধি আছে কি নেই তা তো ধাঁধায় দেওয়া নেই।" তারপর বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ দেওয়া আছে—কৌশলে, অতি সূক্ষ্মভাবে দেওয়া আছে।"

"কীরকম?" সামুর প্রশ্ন।

তেঁতুলমামা বললেন, "যার গেলাসে প্রথম দিনে আরসোলা পড়ল, সে নিশ্চয় দ্বিতীয় দিন সাবধান হবে? অর্থাৎ, খুব ভাল করে ঢেকে রাখবে যাতে একটাও আরসোলা যেতে না পারে, কেমন?"

সামু বলল, "এ তো ঠিক কথা বাবু।"

তেঁতুলমামা উৎসাহিত হয়ে বললেন,—"তাহলে ঐ লোকটা দ্বিতীয় দিনেও 'যখন গেলাসে আরসোলা পেল তখন ধরে নিতে হবে সে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করেনি?"

"ঠিক বলেছেন। কিন্তু, আরও একটা ব্যাপার হতে পারে যে!"

"কী হতে পারে?"

সামু বলল, "ধরুন গিয়ে লোকটির দুধ খেতেই খারাপ লাগে।"

"হুঁ, হতেও পারে তা।"

"তাহলে লোকটা ইচ্ছে করে দুধে আরসোলা দিয়ে রাখতে পারে যাতে দুধ খেতে না হয়।"

"ঠিক কথা!" বললেন তেঁতুলমামা।

"তাহলে লোকটা চালাক—ডাহা চালাক। তাহলে দ্বিতীয় দিনে ঐ একটা আরসোলা দেখেই সে সব দুধ বেসিনে ফেলে দেবে নিশ্চয়।"

"খুব অন্যায় করবে তাহলে। ধাঁধার উত্তর মিলবে না ওসব করলে।" তেঁতুলমামা প্রায় আর্তনাদই করে উঠলেন।

"তাতে ওর বয়েই গেল।" বলল সামু।

তেঁতুলমামা বললেন, "যাকগে, এবার তৃতীয় ধাঁধাটা বলছি। একটা লোক অন্য একটা লোকের কাছ থেকে দুশো ত্রিশ টাকা একান্ন পয়সা ধার করেছে, এখন···।"

এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা দিল। তেঁতুলমামা বললেন, "ও—আমাকে একবার এক আবিষ্কারে বেরুতে হবে, খেয়ালই ছিল না। বোধ হয় আমাকে নিতে এসেছে। বাকি ধাঁধা ফিরে এলে হবে।"

সামু বলল, "দেরি করবেন না। বাইরে কোথাও বেশি খাবেন না, তাহলে চিলি চিকেন-টিকেন সব নষ্ট হবে।"

তেঁতুলমামা বললেন, "না না—যাব আর আসব!"

তেঁতুলমামা ফিরলেন কিন্তু সতেরোদিন পর। এসে সামুকে বললেন, "একটু দেরি হয়ে গেল। গিয়েছিলাম দমদমের এক বাগানবাড়িতে পদ্মফুল ফোটা দেখতে. সে এক দারুণ ব্যাপার"

সামু গম্ভীর। কোনো উত্তর দিল না।

ছবি দেবাশিস দেব

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা: গবাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক আহত; তাঁর জায়গায় যুধিষ্ঠির পড়াচ্ছেন। গবার ঘরে মাঝরাত্তিরে যে ঢুকেছিল, তার মুখে জর্দার গন্ধ। যুধিষ্ঠিরও জর্দাপান খান। সার্কাসে যে-লোক মুখোশ পরে রোমহর্ষক খেলা দেখায়, সেই কি ফেরারি গোবিন্দ মাস্টার? পরিচয় জানতে গোপনে তাঁবুতে ঢুকে দারোগাবাবু আক্রান্ত। পরদিন সকালে তাঁবুতে এসে গবা জানায়, গোবিন্দ মাস্টার খড়ের গাদায় লুকিয়ে আছে। কাকাতুয়া বলে, "রামু, পড়তে বোসো।" রামু পাখিকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ ঠোঁটের ঠোক্কর খায়। বাবাও তাকে বেত মেরেছেন। রামু ইতিমধ্যে গবার মাধ্যমে ছদ্মবেশী গোবিন্দর সন্ধান পায়। গবা বলে, কাশিমের চরে খুন হবার সময় হরিহর পাড়ুই বলেছিল, পাখি সব জানে। তারপর....

॥ ১৪ ॥

একটা শক্ত মামলায় মক্কেলকে জিতিয়ে দিয়েছেন উদ্ধববাবু। বড়লোক মক্কেল সকালেই বিরাট ভেট নিয়ে হাজির। ফলের ঝুড়ি, মিষ্টির চ্যাঙারি, দৈয়ের হাঁড়ি, বারকোষে মস্ত রুইমাছ, ধামাভর্তি শীতের সব্জি। এলাহি কাণ্ড।

মামলায় জিতে উদ্ধববাবুর মনটা আজ ভাল। অন্য একটা মামলার সওয়ালের ফাঁকে-ফাঁকে গুনগুন করে ভৈরবী ভেঁজে নিচ্ছিলেন। আদালতে গান গাওয়া নিষিদ্ধ। হাকিমসাহেব গুনগুনানি শুনে বারবার এধার-ওধার তাকান, কিন্তু কোত্থেকে গানটা আসছে তা বুঝতে পারেন না। বার দুই তিন হাতুড়ি ঠুকে "অর্ডার অর্ডার" হাঁক দিলেন। প্রতিবারই উদ্ধববাবু রুমালে মুখ ঢেকে জিব কাটলেন। কিন্তু গান জিনিসটা ভারী অবাধ্য। ভিতরে গানের ফোয়ারা খুলে গেলে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য।

অবশেষে বিপক্ষের উকিল উঠে হাকিমকে বললেন, "আমাদের লার্নেড ফ্রেণ্ড উদ্ধববাবুর স্বভাব অনেকটা কোকিলের মতো। বসন্ত সমাসন্ন দেখে ওঁর কণ্ঠ 'কুহু কুহু' রবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারপর কোকিল যেমন কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, উনিও তেমনি ওঁর গানের ডিম এই আদালতে পেড়ে রেখে যাচ্ছেন।"

এই অদ্ভুত সওয়ালে হাকিম ভ্রূ কোঁচকালেন, লজ্জিত উদ্ধববাবু ঘাড় চুলকোচ্ছেন। হাকিম আর-একবার হাতুড়ি মেরে আদালতকে চুপ করিয়ে উদ্ধববাবুকে বললেন, "আপনার হিয়ারিংয়ের জন্য আর একটা ডেট নিন। আজ বাড়ি চলে যান।"

হাঁফ ছেড়ে উদ্ধববাবু বেরিয়ে এলেন। বাস্তবিক এতক্ষণ তাঁর হাঁফ ধরে আসছিল, আইঢাই করছিল। পাকা ফোঁড়ার মতো ভিতরে টনটন করছে গান। একটু টুশকি দিলেই বোমার মতো ফেটে পড়বে। সেই টুশকিটা এতক্ষণ দিতে পারছিলেন না।

এজলাসের চৌহদ্দি পার হয়ে রাস্তায় পড়েই গানের ফোঁড়াটায় টুশকি দিলেন উদ্ধববাবু। আর বাস্তবিক সেটা বোমার মতোই ফাটল। হাঁ করে প্রথম তানটা লাগাতেই এত জোর শব্দ হল যে, উদ্ধববাবু নিজেই হকচকিয়ে গেলেন।

শুধু তাই নয়। সেই শব্দে রাস্তার লোকজনও পালাতে লাগল। কাক কা-কা করে উড়ে-উড়ে ঘুরতে লাগল। উদ্ধববাবু তাজ্জব হয়ে দেখলেন, তাঁর গানের ফোঁড়াটা বোমার মতো ফেটে চারদিকে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কেটে যেতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল। তারপর উদ্ধববাবু হঠাৎ বুঝতে পারলেন, শব্দটা তাঁর গলা থেকে বেরোয়নি। অমন বোমার মতো আওয়াজ খুব বড় ওস্তাদদেরও গলা থেকে বেরোবার কথা নয়। যুক্তি অনুসরণ করলে সন্দেহ থাকে না, বোমার মতো আওয়াজটা একটা বোমারই কাজ। আর সেটা ফেটেছে উদ্ধববাবুর মাত্র হাত দশেকের মধ্যে।

রাস্তার আর-পাঁচজনের মতো উদ্ধববাবুও দৌড়োতে লাগলেন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার সময় নেই। গলায় গানটাও আর ঠেলাঠেলি করছে না।

বাড়িতে এসে নিজের ঘরে শুয়ে চোখ বুজে

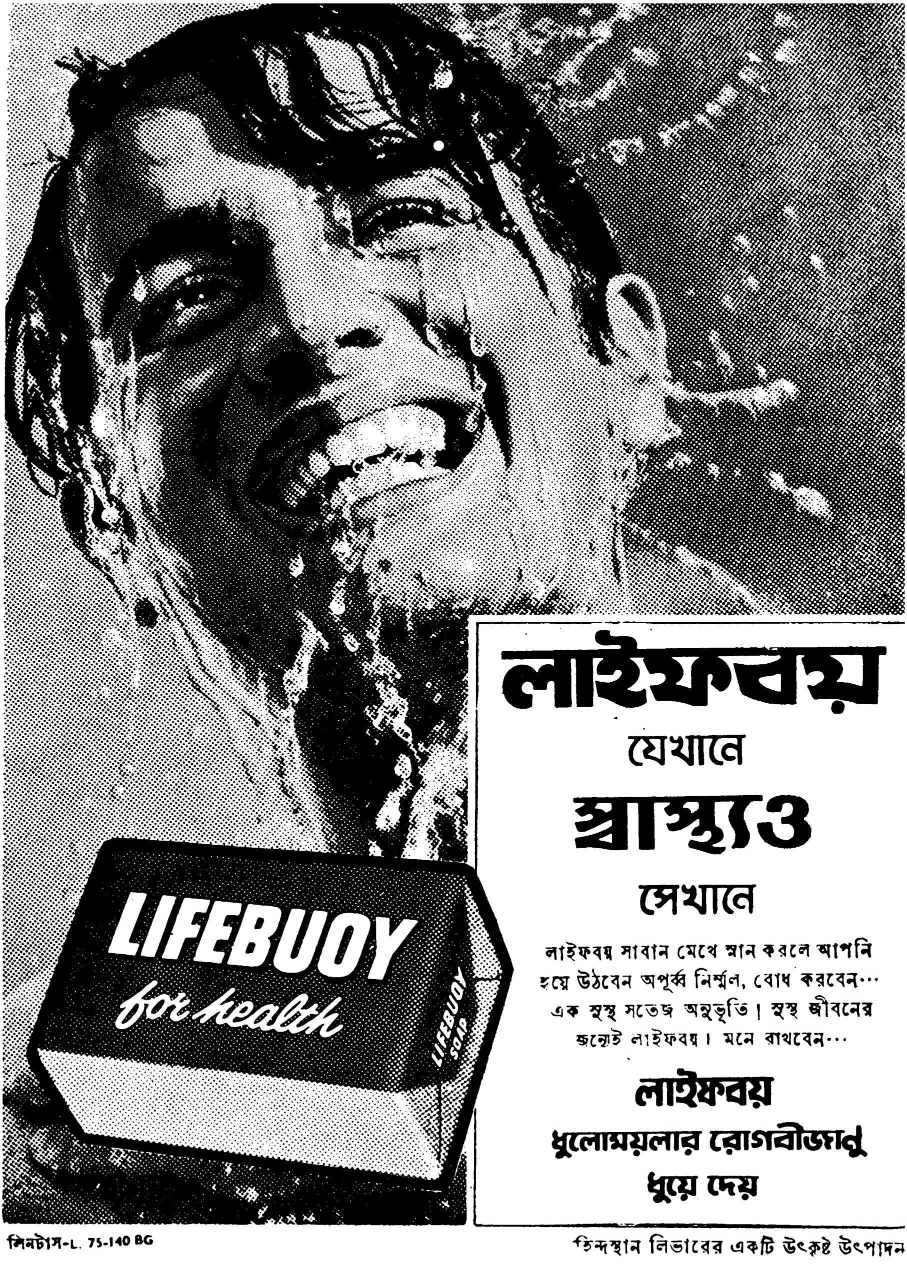

লিনটাস-L. 75-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

অনেকক্ষণ হাঁফ ছাড়লেন উদ্ধববাবু। ব্যাপারটা কী হল তা বুঝতে পারছিলেন না। বোমাটা এত কাছাকাছি ফেটেছে যে, সেই শব্দে তাঁর মাথাটা এখনও ভোম্বল হয়ে আছে। এমন কী শুয়ে-শুয়ে কয়েকবার ভৈরবীতে তান লাগানোর চেষ্টাও করলেন উদ্ধববাবু। কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না।

ভিতরের বারান্দা থেকে কাকাতুয়াটা বলে উঠল, "দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি। দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।"

উদ্ধববাবু কাকাতুয়ার কথা শুনে উঠে বসলেন। মক্কেল যে অঢেল ভেট দিয়ে গেছে, তা ফেলে-ছড়িয়ে খেয়েও শেষ হওয়ার কথা নয়। তাই উঠে ভিতরবাড়ি থেকে একটা রসগোল্লার হাঁড়ি এনে কাকাতুয়াটাকে খাওয়াতে লেগে গেলেন।

কাকাতুয়াটা বেশ চেখে-চুখেই খাচ্ছিল। কয়দিনে পাখিটা উদ্ধববাবুকে খুব চিনেছে। খেতে-খেতে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে উদ্ধববাবুকে দেখছিল। হঠাৎ একটু চাপা গলায় বলল, "কাউকে বোলো না। কাশিমের চরে অনেক মোহর আছে।"

উদ্ধববাবু হাঁ করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, "বলিস কী রে?"

"বিশু জানে না। বিশু জানে না।"

"বিশুটা কে বলবি তো।"

পাখি তখন অন্য কথা বলতে লাগল, "রামু, তুমি ভীষণ দুষ্টু। পড়তে যাও। নইলে গোল্লা পাবে।" তারপর আবার স্বর পালটে বলে, "দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।"

চারদিকে চেয়ে উদ্ধববাবু পাখির দাঁড়টা বারান্দা থেকে নিজের ঘরে এনে রাখলেন।

উদ্ধববাবু বিস্তর মামলা-মোকদ্দমা করেছেন। তিনি জানেন, যার কাছে কোনো গোপন খবর থাকে, তার জীবন সর্বদাই বিপদসংকুল। এই পাখিটা নিশ্চিত লুকোনো সম্পদের খবর জানে। এ পর্যন্ত পাখিটার ওপর হামলাও কিছু কম হয়নি। কিন্তু এতকাল কাকাতুয়াটা কাশিমের চরের কথা বলেনি। কেউ যদি কথাটা শুনতে পায়, তবে যেমন করেই হোক হন্যে হয়ে পাখিটাকে হাত করার চেষ্টা করবে। তার জন্য খুন পর্যন্ত করতে পিছপা হবে না।

উদ্ধববাবু আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বিছানায় গা ঢালতেই পিঠের নীচে কী একটা খচখচ করে উঠল। উঠে দেখলেন একটা খাম, তাতে ওঁর নাম লেখা।

খাম খুলতেই একটা চিঠি।

মহাশয়, কাকাতুয়াটিকে ফেরত পাইবার জন্য যে প্রস্তাব দিয়াছিলাম তাহা আপনি কার্যত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বুঝিতেছি সহজ পথে আপনি পাখিটিকে ফেরত দিবেন না। তাহাতে অবশ্য আমাদের কিছুই না, বিপদ আপনারই। আজ আদালতের বাহিরে যা ঘটিল, তাহা একটি নমুনা মাত্র। বোমাটিতে কেবল আওয়াজের মশলা ছিল, ক্ষতিকারক কোনোকিছু ছিল না। আপনাকে আমাদের সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিতেই এই কাজ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার

ছবির মজা

পাঁচ জোড়া জিনিস আছে এখানে। ইংরেজিতে ভাবলে দেখবে, পাঁচ জোড়া মিলও আছে। কে কার সঙ্গে মিলবে, বলতে পারো?

(ব্যাগ ফ্ল্যাগ, কোট বোট, বুক হুক, শেল বেল, টানেল ফানেল)

রং-পেনসিল বুলিয়ে ছবিটিকে রঙিন করবার আগে পাঁচটি পোকা খুঁজে নাও

পর যদি কখনো আমাদের বোমা প্রয়োগ করিতে হয়, তবে এবার তাহার মধ্যে মারাত্মক বস্তু সকলই থাকিবে। মনুষ্যজীবন অতীব মহার্ঘ বিবেচনা করিয়া ভালয়-ভালয় পাখিটিকে আমাদের হাতে তুলিয়া দিবেন। বেশি কিছু করিতে হইবে না। আপনাদের বাহিরের বারান্দায় আজ রাতে পাখির দাঁড়টা (পাখি সমেত) ঝুলাইয়া রাখিবেন। কোনো পাহারা রাখিবেন না। আমরা যথাসময়ে তাহা হস্তগত করিব। ক্ষতিপূরণ বাবদ যথেষ্ট অর্থও আপনি পাইবেন। ইতি।

এর আগের চিঠিতে 'আমি আমি' করে লেখা ছিল। এই চিঠিতে বহুবচনের 'আমরা'।

উদ্ধববাবু চারদিকে চেয়ে দেখলেন। শোওয়ার ঘরের তিন দিকেই বড়-বড় জানালা। দক্ষিণ দিকে বাগান, পুবদিকেও বাগান, উত্তরদিকে কলতলা। পত্রবাহক কোন্ দিক দিয়ে এসে টুক করে এই অল্প সময়ের মধ্যে জানালা গলিয়ে বিছানায় চিঠিটা বিছানায় ফেলে গেছে, তা অনুমান করা শক্ত। তবে এরা যে বেশ সংগঠিত দল তাতে সন্দেহ নেই।

উদ্ধববাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "হুঁ।"

পাখিটাও তার 'হুঁ' শিখে গেছে। সেও বলল, "হুঁ।"

উদ্ধববাবু কাকাতুয়ার দিকে চেয়ে দেখলেন পাখিটাও তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। বড় মায়া পড়ে গেছে উদ্ধববাবুর। উঠে গিয়ে কাকাতুয়ার পালকে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন "কেন যে বাবা গোপন কথাগুলো শিখতে গেলি। এখন তোরও বিপদ, আমারও বিপদ।"

পাখিটা হঠাৎ আর্তস্বরে বলে উঠল, "বিশু, আমাকে মেরো না! মেরো না!"

উদ্ধববাবু চমকে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। না, কেউ কোথাও নেই। পাখিটা পুরনো মুখস্থ বুলিটা বলছে।

আলমারি খুলে উদ্ধববাবু তাঁর বাবার আমলের দোনলা বন্দুকটা বের করলেন। বহুকাল কেউ বন্দুকটা চালায়নি। উদ্ধববাবু বন্দুকটা পরিষ্কার করতে বসে গেলেন।

ভয়ের চেয়ে ভালবাসা অনেক বড়। উদ্ধববাবু ভয়ের কাছে হার মানতে রাজি নন।

(ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ২৭ ॥

বাড়ির কেউ বিশেষ কোনো সম্মান বা জীবনে বড় রকমের প্রতিষ্ঠা লাভ করলে পরিবারে, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের মধ্যে নানা রকম প্রতিক্রিয়া হয়। প্রতিক্রিয়াগুলি যদি আমি বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মনের ও চরিত্রের একটা ছবি বেশ ফুটে ওঠে। বসুবাড়িও ব্যতিক্রম ছিল না।

বলাই বাহুল্য, রাঙাকাকাবাবু কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে বসুবাড়ির ছোটবড় সকলেরই মর্যাদা বেড়ে গেল এবং সকলেই বেশ গৌরব বোধ করলেন। তবে আমার মনে হয় রাঙাকাকাবাবু 'রাষ্ট্রপতি' হবার আগে পর্যন্ত বসুবাড়ির মধ্যমণি ছিলেন না। অনেকেই তাঁকে দূর থেকে দেখতেন বা দূরত্ব রেখে চলতেন, এমনও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা ফিরেও তাকাতেন না। এখন থেকে কিন্তু রাঙাকাকাবাবুকে ঘিরেই বসুবাড়ি চলতে লাগল। সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। মা-জননীর ইচ্ছায় তিনি অনেকদিন পরে এলগিন রোডের সাবেক বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করলেন। দাদাভাইয়ের শোবার ঘরটি তাঁর জন্য বরাদ্দ হল। বাড়ির অনেক ব্যবস্থা পালটাতে হল। কারণ সভাপতির তো একটা ভাল অফিস চাই। তাছাড়া রোজ কত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, বসবার জায়গা চাই। বাড়ির পেছনের দিকের একটা বড় ঘর খাওয়াদাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত, সেটা আসবাবপত্র গুছিয়ে রাঙাকাকাবাবুর অফিস হল। আজও নেতাজী ভবনে ঘরটি একইভাবে সাজানো আছে। অতিথিদের বসবার জন্য নীচের তলায় একটা ও উপর তলায় একটা ঘর রাখা হল।

অনেকদিন বাংলা থেকে কেউ কংগ্রেসের সভাপতি হননি। সেই ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন দেশবন্ধু দাশ। পরে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কলকাতার এস্‌প্ল্যানেডে বেআইনি কংগ্রেসের একটি বিশেষ ও ক্ষণস্থায়ী অধিবেশনের সভানেত্রীত্ব করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তা। এতদিন পরে রাঙাকাকাবাবুর এই পদ লাভ করার একটা বিশেষ ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ছিল। একথাটা আজ বাংলা দেশে অনেকেই ভুলে গেছেন। প্রথমত, বাংলার জনমানসে সেদিন একটা নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বাংলার রাজনীতিতে তখন একটা ছন্নছাড়া ভাব এসেছিল, সেটা কেটে গেল। তৃতীয়ত, বাংলার বিপ্লববাদী রাজনৈতিক কর্মীরা রাঙাকাকাবাবুর মাধ্যমে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে খানিকটা প্রতিনিধিত্ব পেলেন। চতুর্থত, ব্যাপারটা ছিল মহাত্মা গান্ধী ও রাঙাকাকাবাবু দুজনের দিক থেকেই একটা ঐতিহাসিক এক্সপেরিমেণ্ট। স্বাধীনতা-সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতীয় সংগ্রামের দুটি স্রোত যুক্ত করে অগ্রসর হবার চেষ্টা দুদিক থেকেই করা হয়েছিল। আমি অবশ্য কট্টর ও গোঁড়া সুভাষবিরোধীদের কথা বাদ দিচ্ছি। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত গান্ধী-সুভাষ সম্পর্কের ইতিহাস ও দেশের রাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া, আমাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেবল অতীতকে বোঝবার জন্যই আমি একথা বলছি না। আজকের রাজনীতি মূলত সেই সময়কার ঘটনাবলীরই পরিণাম। ঐক্যবদ্ধ ও প্রগতিশীল ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে হলে গান্ধীজির গণজাগরণ ও লোকশক্তির পথ এবং সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক সংগ্রামী ও বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের একটা সমন্বয় ঘটানো যায় না? এ প্রশ্নের উত্তর আজকের যুবসমাজ দিতে পারে

PHONE : PARK 679

38-2, ELGIN ROAD,
CALCUTTA.

উডবার্ন
৬/২/২৮

শ্রীচরণেষু—
মা!

আমি [illegible] ছাড়া [illegible]। [illegible] ১১টা [illegible] ছাড়া হল। [illegible] ১১টা [illegible] পৌঁছেছি।

আপনি কি [illegible] না? [illegible] আমি খুব সুখী হব। [illegible] আপনি [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] - [illegible] চিঠি নেই। [illegible] [illegible] [illegible] নেই — আমাদের কুশল। [illegible] ৫৩০ [illegible] ([illegible]) [illegible] ১১টা ছাড়া হল।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।

ইতি
আপনার সেবক
সুভাষ

পুঃ -
[illegible] ভুলবেন না —
"[illegible]"
সুভাষ

বাসন্তী দেবীকে লেখা, সুভাষচন্দ্রের চিঠি

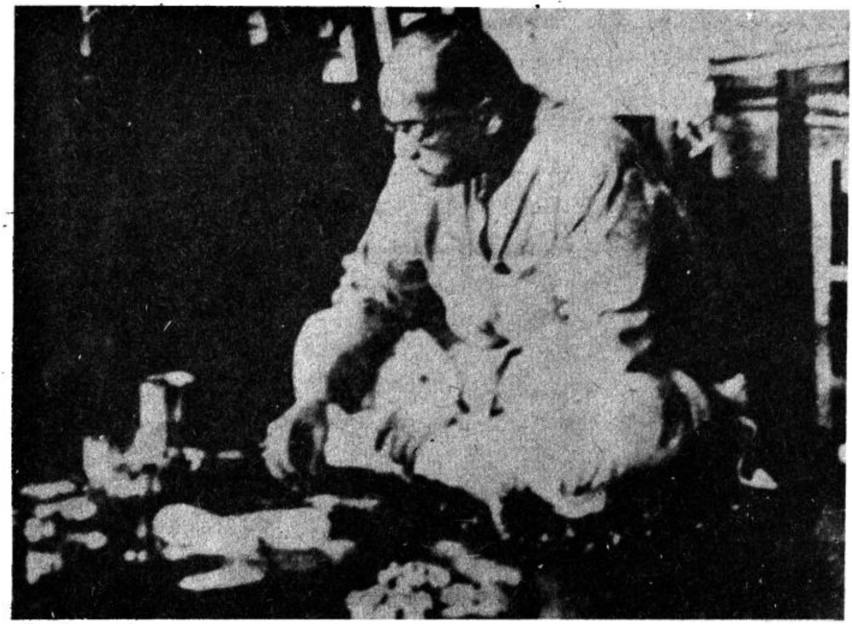

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে আপ্যায়ন

একটা অপ্রিয় কথা না বলে পারছি না, যদিও ব্যাপারটা গুটিকতক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই খাটে। রাঙাকাকাবাবুর সমসাময়িক কোনো কোনো রাজনীতিবিদ্ ও বন্ধু তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় বেশ ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ও জনজীবনে মানুষের চরিত্রের এই দুর্বলতা প্রায়ই দেখা দেয়। যাঁরা বড় তাঁরা উদার হয়ে এসব উপেক্ষা করেন।

মা-জননী, বাবা, মা ও বাড়ির অন্য অনেকে দল বেঁধে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে হরিপুরায় গিয়েছিলেন। রাঙাকাকাবাবুর খুব ইচ্ছা ছিল যে বাসন্তী দেবীও তাঁর সঙ্গে হরিপুরায় যান। এ বিষয়ে তিনি ঠাকুমাকে একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লেখেন, কিন্তু ঠাকুমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কংগ্রেস খুব জমকালো হয়েছিল। একান্নটি বলদ দিয়ে টানা এক্কাগাড়ি ধরনের একটা সাজানো রথে বসিয়ে সভাপতিকে বিরাট শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দৃশ্যটি ফিল্‌মে ধরা আছে এবং আমরা মাঝে মাঝে দেখি। সভাপতির অভিভাষণ রাঙাকাকাবাবু খানিকটা হিন্দিতে পড়েছিলেন। যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরা বলেন যে তখনও তিনি ঠেকে ঠেকে হিন্দি বলতেন। অবশ্য আগে থেকেই তিনি হিন্দি শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। শেখবার জন্য একজন শিক্ষকও রেখেছিলেন। অমায়িক, স্বল্পভাষী ঐ পণ্ডিতজি যে কেবল বাড়িতে এসে রাঙাকাকাবাবুকে হিন্দি অভ্যাস করাতেন তাই নয়। রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে তিনি সফরেও যেতেন, যাতে ক্রমাগতই হিন্দি শিক্ষা চলতে পারে। কয়েক মাসের মধ্যেই রাঙাকাকাবাবু হিন্দিভাষা বেশ রপ্ত করে ফেললেন। ক্রমে ক্রমে কথাবার্তায় ও বক্তৃতায় তিনি উর্দু কথা মেশাতে আরম্ভ করলেন। শুনেছি, অন্য কেউ সভায় হিন্দুস্তানি বা উর্দুতে বক্তৃতা করলে রাঙাকাকাবাবু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং নতুন কয়েকটি কথা মনে মনে তুলে নিতেন। পরের সভায় তিনি নিজেই সেই কথাগুলি ব্যবহার করতেন।

রাঙাকাকাবাবুর হরিপুরা ভাষণ স্কুলকলেজের ছেলেমেয়েদের মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত। ঐ ভাষণে তিনি ইতিহাসের পটভূমিতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃতি, গতি ও লক্ষ্যের একটা পরিষ্কার ছবি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানভিত্তিক ও

স্বাস্থ্য ঝলমল, প্রাণে খুশী উচ্ছল!

বোর্নভিটা খান...জীবনটা হাসিখুশিতে ভরিয়ে দিন। মজাদার বোর্নভিটা আপনার পরিবারকেও দিন। স্বাদেভরা বোর্নভিটা, কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির গুণে ভরপুর। এর নির্মাতা ক্যাডবেরি— গত ১০০ বছর ধরে পানীয় আহার তৈরীতে যারা সিদ্ধহস্ত।

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

আপনাদের জন্যে গুণে ভরপুর!

এবার! বড়রকম সঞ্চয়
পুরো এক টাকার
রিফিল প্যাকের সঙ্গে

OBM 6450 BN

বাস্তবধর্মী। রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে কোনো গোঁড়ামি—যা আজ আমরা এত দেখতে পাই—তাঁর মধ্যে ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের জাতীয় ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত বিচার করে দেখলে হয়। তিনি বলেছিলেন যে, হিন্দুস্তানি—হিন্দি ও উর্দুর একটা সহজ সংমিশ্রণ—আমাদের জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। আরও বলেছিলেন যে, জাতীয় সংহতি ও যোগাযোগের সুবিধার জন্য রোমান বা ল্যাটিন লিপি আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

বসুবাড়ির যাঁরা রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে হরিপুরায় গিয়েছিলেন তাঁরা বেশ আদরযত্ন পেয়েছিলেন। গুজরাটের জীবনযাত্রার ধরন তো অন্য রকম, বিশেষ করে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে। তা সত্ত্বেও দেশের যেখানেই যাই না কেন, বুঝতে পারি কেমন একটা মূলগত ঐক্যের বাঁধনে আমরা ভারতবাসীরা একসূত্রে বাঁধা। আর-একটা বড় কথা হল, গান্ধীজির ইচ্ছায় ও নির্দেশে বার্ষিক অধিবেশনগুলি গ্রামে করার নীতি কংগ্রেস সবেমাত্র গ্রহণ করেছে। যেটা কদিন আগেও একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল, সেখানে অত বড় সম্মেলনের ও জনসমাবেশের জন্য সবরকম ব্যবস্থা দেখে আমাদের বাড়ির সকলেই খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

শুনেছি, হরিপুরায় রাষ্ট্রপতির মা, আমাদের মা-জননীর বিনয় ও স্বাভাবিকতা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়টা তো ছিল ত্যাগ ও সেবার যুগ। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে দম্ভের অভিব্যক্তি ছিল কম।

হরিপুরা কংগ্রেসের পর রাঙাকাকাবাবু মা-জননী ও বাড়ির অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়ে বোম্বাই যান। সেই সূত্রে বোম্বাইয়ে এক গুজরাটি দম্পতি নাথালাল পারিখ ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসুবাড়ির বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁদের বাড়িতেই রাঙাকাকাবাবু অতিথি ছিলেন। পরেও যতবার বোম্বাই গিয়েছেন তাঁদের বাড়িতেই থেকেছেন। ইউরোপে থাকতেই নাথালালের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। ১৯৩৮ থেকে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

১৯৩৮ সালের শেষের দিকে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে রাঙাকাকাবাবু একটা বিরাট কাজের সূচনা করেছিলেন—স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশ পুনর্গঠনের পরিকল্পনার জন্য ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন। সেই সূত্রে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাকে বেশ কয়েকবার এলগিন রোডের বাড়িতে এসে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে দেখেছি।

(ক্রমশ)

তবুও পৃথিবীই ঘোরে

প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগেকার কথা। রোমের ভ্যাটিক্যান নগরীতে রোমান ক্যাথলিকদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় আদালতে বিচার চলছে। আসামী এক সত্তর বছরের বৃদ্ধ, অসুস্থ, অশক্ত। তাঁর অপরাধ? তিনি একটি বই লিখেছেন, তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণার ফল। তাতে তিনি বলেছেন, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। চার্চের কর্তাব্যক্তিদের মতে এ-কথা বলা মহাপাপ, কেননা তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস বলে, পৃথিবী স্থির, সূর্যই ঘুরছে তাকে ঘিরে। বৃদ্ধ দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে। বিচারকদের সামনে নতজানু হয়ে বৃদ্ধ গ্যালিলিওকে স্বীকার করতে হল, তাঁর মত ভ্রান্ত, চার্চের মতই ঠিক। মুক্তি পেয়ে তিনি বিচারসভা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন আশপাশের লোকরা শুনল, তখনও তিনি আপন মনেই বিড়বিড় করে বলছেন, "তবুও পৃথিবীই ঘোরে।"

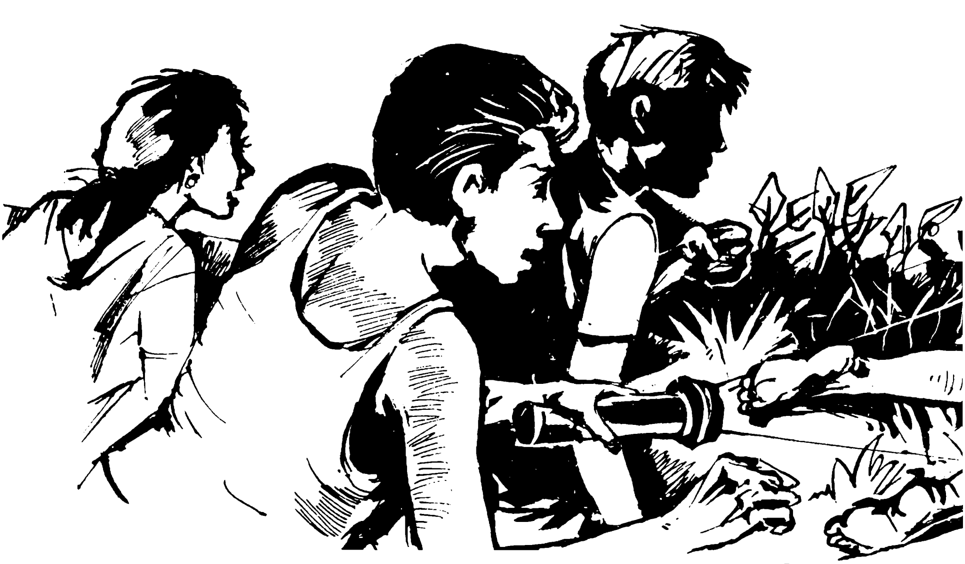

অদৃশ্য হাত

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

"অতৃপ্ত আত্মার কাহিনীতে যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে চুপ করে যাবেন, কিন্তু দোহাই আপনাদের, বিদেহীদের নিয়ে রসিকতা করতে যাবেন না।"

কথাটা বললেন ডঃ সমরেশ সেন। এক সময় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডাকসাইটে কলেজের জিওগ্রাফির অধ্যাপক। কিন্তু বছর দশেক হল চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশের বাড়ি দক্ষিণ চাতরায় এসে ফার্মিং করছেন। আমাদের কাগজে কৃষি কথার উপর একটি ফীচার লেখার জন্য তাঁর ফার্মে হাজির হয়েছিলাম। ডঃ সেনের চাষবাস, ডেয়ারি পোলট্রি দেখতে গেলে সময় লাগবে পাকা দুদিন। প্রথম দিন রাতে আমরা তাঁর খামারবাড়ির বৈঠকখানায় আড্ডা জমিয়েছি। আমি, স্থানীয় তিন-চারজন ভদ্রলোক ও ডঃ সেন। ঘরের একপাশে টেলিভিশনে একটি ইংরেজি ভূতের ছবি দেখানো হচ্ছিল। এক জরাজীর্ণ মধ্যযুগীয় দুর্গে এক ভদ্রলোকের রাত্রিবাসের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।

ছবিটি দেখতে দেখতে স্থানীয় হাইস্কুলের বিজ্ঞান-শিক্ষক সুমিতবাবু বললেন, "ভূতেদের একটা মজা কী জানেন, তারা পুরনো বাড়িতেই বাসা বাঁধে। এ-ব্যাপারে চামচিকেদের সঙ্গে তাদের একটা অদ্ভুত মিল আছে।"

স্থানীয় ব্যাংক-ম্যানেজার মাধববাবু বললেন, "পুরনো বাড়ি আর ভোঁতা মগজই হল ভূতের বাসা। কিঞ্চিৎ পরিমাণ গঞ্জিকা সেবন করে মাথাটার একটু বিকৃতি না ঘটালে ভূত ঠিক মগজে ভর করতে পারে না।"

স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার নিরুপমবাবু বললেন, "তবু মশাই এই সিনেমায় আর গল্পের বইয়েই যা-কিছু ভূত-টুত দেখা যায়। বাস্তব জগতে তাদের অস্তিত্ব কবেই শেষ হয়ে গেছে। আমি তো মশাই সারা জীবনে—"

"থামুন!" হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক চিৎকারে আমরা চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখলাম ডঃ সমরেশ সেনের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। ভদ্র, মার্জিত, বন্ধুবৎসল সমরেশ সেনের হঠাৎ এই অস্বাভাবিক রূপান্তর আমাকে অবাক করল। অতি দ্রুত যে হালকা বৈঠকি পরিবেশটির অমন পরিণতি ঘটবে, তা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি।

ডঃ সেন বললেন, "অতৃপ্ত আত্মার কাহিনীতে যদি বিশ্বাস না করেন, তাহলে চুপ করে থাকবেন।"

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। টিভিতে ছবিটি শেষ হয়ে লঘু সংগীত হচ্ছিল। ডঃ সেন গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এলেন টিভি। তারপর বললেন, "সরি। আই অ্যাম ভেরি সরি। কিন্তু আপনাদের আমি কী করে বোঝাই যে, একদিন আপনাদের মতো এমন হালকাভাবে সব কিছু উড়িয়ে দিয়েছিলাম বলেই এক ভয়ংকর অভিশাপের বোঝা আজও আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আপনারা কেউ জানেন না। কতটুকু দেখেছেন আপনারা?"

আমি বললাম, "ডঃ সেন, না-জেনে আপনার কোনো বিশ্বাসকে আহত করায় আমরা দুঃখিত। দেখুন, ব্যাপারটিকে আমরা হালকা ভাবেই নিয়েছিলাম, বুঝিনি...."

ডঃ সেন আবার বললেন, "আপনারা ভাবছেন আমি পাগল, তাই না? হঠাৎ অমন চিৎকার করে উঠলাম কেন? কিন্তু মাপ করবেন, বরুণবাবু, আপনি দুদিনের অতিথি। আপনার সামনে এইভাবে মেজাজ খারাপ করা আমার উচিত হয়নি। তবু, প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তখন আপনাদের কাছে আমি আমার নিজের জীবনের এক সবচেয়ে ভুল, সবচেয়ে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় তুলে ধরতে চাই। আপনাদের মতো আমিও অশরীরী আত্মায় বিশ্বাস করতাম না বরুণবাবু। তাদের নিয়ে উপহাস করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন বুঝতে পারিনি, তার জন্য চরম মাশুল দিতে হবে একটি নিরাপরাধ মেয়েকে। হ্যাঁ, সেই মেয়েটি ছিল অসীম সাহসী, প্রাণবন্ত, আর বাঙালি মেয়েদের মধ্যে একজন নামকরা অ্যাথলেট। নানা পত্রিকায় তাকে নিয়ে একসময় ফীচারও বার হয়েছিল। নাম ছিল তার মঞ্জুলা—মঞ্জুলা মিত্র। মেয়েদের ইন্টার কলেজ দৌড় প্রতিযোগিতায় পরপর দুবার প্রথম হয়েছিল সে। ইন্টার-ভারসিটি স্পোর্ট্স মীটে যোগ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল সে। আর সেই সময়েই ঘটল দুর্ঘটনাটি। ওঃ গড! আজও, আজও সে-রাতের কথা মনে করলে আমি শিউরে উঠি।"

ডঃ সেন বলে চললেন ঃ

আজ থেকে দশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন ত্রিশ বছরের যুবক। সরকারি কলেজে জিওগ্রাফি পড়াই। প্রতি বছর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফীল্ড স্টাডিতে যাই। সেবারে গিয়েছিলাম রাজগির। দলে ছিল আটজন ছেলে। দুজন মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে ছিল ওই মঞ্জুলা।

শহরের এক প্রান্তে ওই বাড়িটি কলকাতার এক ব্যবসায়ীর। ভদ্রলোক কালেভদ্রে আসেন। বাগান-ঘেরা বিরাট বাড়িটি তালাচাবি দেওয়া পড়ে থাকে। আউট-হাউসে থাকে দারোয়ান। আমাদের আসার খবর পেয়ে দারোয়ান

বাড়িটি যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বাড়ির পজিশনটিও ভাল। একেবারে বাস স্ট্যাণ্ডের লাগোয়া। কয়েক পা এগুলেই দোকানপাট। হোটেল। কিন্তু এত জমজমাট জায়গায় বাড়িটি এতদিন এইভাবে খালি-খালি পড়ে আছে কেন জিজ্ঞাসা করতেই দারোয়ান বলল, "হুজুর, এ-বাড়ি কেউ কিনবে না। লোকে বলে এ-বাড়িতে ভূত আছে।"

"ভূত তুমি দেখেছ?" ছেলেদের সামনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

দারোয়ান বলল, "না, হুজুর, তবে আমি তো ওই বাড়িতে থাকি না। মাঝে-মাঝে দু-চারজন এসে থাকেন। তাঁরা বলেন। একবার মালিক বলেছিলেন বাড়িটা হোটেল করবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে যান। এত টাকা খরচ করার পরে যদি শেষে কোনো লোকজন না আসে।"

আমার এক ছাত্র অমল হেসে বলে উঠল, "ভাল হবে সার, এ-বাড়িতে থাকলে ভূত দেখা যাবে।"

কার্তিক বলল, "আমরা কোনোদিন ভূত দেখিনি সার।"

আমি বললাম, "কী মঞ্জুলা, জয়া, ভূতের নাম শুনে তোমাদের ভয় করছে নাকি?"

মঞ্জুলা বলল, "আমি ট্রেনে একটা ভূতের গল্প বলেছিলাম, কার্তিকেরই মুখ চুন হয়ে গিয়েছিল সার। সারা রাস্তা ট্রেন থেকে নামেনি।"

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। কার্তিক কী একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার প্রতিবাদ চাপা পড়ে গেল।

বাড়ির নীচের তলায় দুখানা বড় বড় ঘর আর একটি ছোট ঘর ও বারান্দা। দোতলায় দুখানা ঘর। নীচের তলায় গিয়ে দেখা গেল, একখানা ঘরে পুরনো আসবাবপত্র বোঝাই।

আমি বললাম, "এক কাজ করা যাক। নীচের তলায় বড় ঘরে ছেলেরা থাকুক। আমি থাকছি পাশের ছোট ঘরে, মেয়েরা থাকুক দোতলায়। এই মঞ্জুলা, দোতলায় তোমরা দুই মেয়ে একা-একা থাকতে পারবে তো? তা না হলে তোমরা এই নীচের ঘরে থাকো। আমি ওপরে চলে যাচ্ছি।"

মঞ্জুলা বলল, "পরীক্ষা করে একবার দেখুন না সার। কী জয়া, তুই পারবি না?"

জয়া মঞ্জুলার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

ওর ভয়ে-ভয়ে হ্যাঁ বলা শুনে ছেলেরা হেসে উঠল। তাতে আরও জেদ চেপে গেল মঞ্জুলার। সে বলল, "শুধু আমরা দুজনই থাকব। দোতলায়। দেখবি, ভূতে যদি ধরে, তোদেরই ধরবে।"

তখন বয়স কম আমার। মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চেপে গেল। মঞ্জুলার প্রচণ্ড সাহস। সে রাইফেল শুটিং করে। একা-একা দিল্লি-বোম্বে চলে যায়। তার স্বাস্থ্যও খুব ভাল। তাকে ভয় দেখাবার একটা লোভ আমাকে পেয়ে বসল।

আমি ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, আজ রাত দুটো নাগাদ ক'জন ছেলে চুপিচুপি ছাদে গিয়ে ভারী বুট পরে দৌড়দৌড়ি করবে। নীচেই মঞ্জুলাদের ঘর। মঞ্জুলা ভয় পেলেই আমরা ছুটে যাব। আজ পরীক্ষা হবে ওর সাহসের।

আমার ঘরে আমি শুয়ে আছি। রাত গড়িয়ে আসছে। চারিদিকে নিথর নিস্তব্ধ। ঘড়িতে দেখি বাজে বারোটা। এখনও দুঘণ্টা বাকি। ঘুমে আমার চোখ বুজে এল।

হঠাৎ ছাদের উপর দুমদাম আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। আলো জ্বেলে ঘড়িতে দেখি রাত একটা। একী, একঘণ্টা আগেই কি ছেলেরা ছাদে উঠে গেল নাকি? তেমন তো কথা নয়।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে পাশের ঘরে গেলাম। দেখি ছেলেরা সব বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। কে? কে গেল ছাদে? না, ছেলেদের কেউ যায়নি। তারা তো সবাই ঘুমোচ্ছিল। এক, দুই, তিন, চার। সবাই তো ঘরে। তবে ছাদে কে? ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে সকলের। সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ কানে এল। এ-গলা মঞ্জুলার। কে যেন মঞ্জুলার কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। একটা চাপা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

ছেলেদের নিয়ে দুড়দাড় করে ওপরে উঠলাম। দোতলার ঘরের দরজা খোলা। ঘরের

বিছানায় বসে জয়া ঠকঠক করে কাঁপছে। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, ছাদে পায়ের আওয়াজ শুনে মঞ্জুলা টর্চ নিয়ে এক-একা উঠে গেছে। ও বুঝতে পেরেছিল আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা। যাবার সময় বলে গেছে জয়াকে, 'আমি ওদের উচিত শিক্ষা দিয়ে আসছি।' তারপরেই এই আর্তনাদ।

সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠছি। সেই সময় আর্তনাদ থেমে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ছাদ থেকে ধপাস করে কী একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ শুনলাম। ছাদে উঠে দেখি কেউ নেই। সমস্ত ছাদ ফাঁকা। নীচের বাগানে টর্চ ফেলতেই শিউরে উঠলাম। মঞ্জুলার দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঝোপের ভেতর।

ডঃ সেন একটু থেমে আবার বললেন, "মঞ্জুলা প্রাণে বেঁচে গেল। কিন্তু ওর পা দুটি চলে গেল জন্মের মতো। প্রাণচঞ্চলা একটা মেয়ে, এক সেরা অ্যাথলেট মঞ্জুলা মিত্র চিরদিন হারিয়ে গেল। আর সবচেয়ে যে রহস্যটি আজও এখনও উন্মোচিত হয়নি, তা হল সে-রাতের ঘটনা। মঞ্জুলা বলেছিল, ছাদে আসতেই একটা অদৃশ্য হাত তার গলা টিপে ধরে। তারপর আমরা এসে পড়তেই সেই অদৃশ্য হাত তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। কিন্তু সে কাউকে যে দেখেনি, এ-কথা আজও হলফ করে বলতে পারি।"

আবার একটু চুপ করে রইলেন ডঃ সেন। তারপর বললেন, "সেই ঘটনার পর আমি চাকরিতে ইস্তফা দিই। চলে আসি গ্রামের বাড়িতে। নতুন জীবন শুরু করি। একদিনের রসিকতার মাশুল যে সারা জীবন ধরে একটি নিরপরাধ মেয়েকে গুনতে হচ্ছে, এটাই আমার বড় দুঃখ। তাই বলছিলাম, অশরীরী আত্মাকে নিয়ে রসিকতা করবেন না।"

আমাদের কথা শেষ না হতেই ক্রাচে ভর দিয়ে এক ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে বললেন, "বরুণবাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

ডঃ সেন আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, "এই হল আমার স্ত্রী মঞ্জুলা।"

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মজার ছড়া

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

মজার ছড়া, মজার ছড়া,
আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ে,
ঝর্‌ঝরিয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে
সারাটা দিন কলস্বরে।

কেউ বা সবই শুনতে পারে
কেউ বা শুধু একটু শোনে।
ছোট্ট ছেলে, ছোট্ট মেয়ে,
ছড়ার সুরে নাম্‌তা গোনে।

ফুলের চারা লতিয়ে ওঠে—
বেরাল মাসি বাজায় বাঁশি।
বাঘবাবাজি, গোরুদিদি,
ঘুরে বেড়ায় পাশাপাশি।

মজার ছড়া, মজার ছড়া
মেঘের ফাঁকে, জলের টানে—
ঝিঁঝিঁপোকা কাঁসর বাজায়
মজার ছড়ার গানে গানে।

ছেলেমেয়ের জন্যে ছড়া
ঘুরে বেড়ায় গাছে গাছে,
হঠাৎ হাওয়ায় চমক লাগে—
দু হাত তুলে ভালুক নাচে।।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সদাশিব

অগ্নিকাণ্ড চিত্রনাট্য ঃ তরুণ মজুমদার
ছবি ঃ বিমল দাশ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
মাঠে ···
হাঁটতে পারছ ?
পারছি। মাথা ঘুরে গিয়েছিল।
ডাক্তার দরকার নেই।
বাঁ পায়ে মেরে জেরিকে বল দিচ্ছে রয় ···
উঃ !
আবার কী হল ?
বাঁ পায়ে কিছু একটা হয়েছে !
জেরির শট ইতালিয়ান গোলকীপার ফিস্ট করেছে !
বল যাচ্ছে রয়ের কাছে ! বাঁ পায়ে মারবে ?
না ···
ডান পায়ে মারব
গো-ও-ও-ল !
খেলা এগোচ্ছে ···
হয় ডান পায়ে মারছে, নয়তো ···
হেড করছে !
গো-ও-ও-ও-ল
টু নিল !
বিরতির সময় ···
আমার জায়গায় ট্রেভর ক্যাসিডিকে নামাও !
এসো. তোমার বাঁ পা একবার দেখি !

ড্রেসিং রুমে···
একটু ফুলেছে! বাচ্চাটাকে বাঁচাতে ধকল হয়েছিল তো!
ঠিক।
একটু ম্যাসাজ করলেই ঠিক হয়ে যাবে।
প্রথম খেলায় দু'দুটো গোল দিয়েছে রয়···
আর কি গোল হবে!
ওদের ডিফেন্স তো তছনছ
দারুণ খেলা!
থ্রী নিল!
জিমির বলে···
ব্ল্যাকির গোল!
খেলা শেষ···
দারুণ খেলেছ এবারে ফোর্ট মারেতে সেমি-ফাইনাল!
সে' তো অনেক দূর!
ট্রিপটা ভালই হবে!
পরদিন সকালে··· যাত্রার সময়···
কী হল রয়?
ভীষণ মাথা ধরেছে!
একবার ডাক্তার দেখানো ভাল!
আগে তো ফোর্ট মারেতে পৌঁছই!
দু ঘন্টা বাদে···ধুধু প্রান্তর দিয়ে বাস চলেছে···
ভীষণ গরম! লোকজনও দেখছি না!
শুধু দুটো এমু!
এখানে বাস বিগড়োলে বিপদ হবে·
হঠাৎ···
উঃ!
কী হল?
ধরো, রয়কে ধরো!
কী হল রয়ের? মাথার অসুখ, না অন্য কিছু!
এর পর আগামী সংখ্যায়

সেই সন্ধ্যায়···
হুজুর, খেমিখলে একজন বিদেশী গ্রেফতার হয়েছে!
বটে?
তার কাছে পাওয়া কাগজ থেকে মনে হয়, জাহাজে করে আপনার জন্য অস্ত্রশস্ত্র আসছে।
লোকটাকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে এসো।
পরদিন সকালে···
এসো, জেলখানায় নিয়ে তোমাকে জেরা করা হবে।
ওই তো! আস্তে চালাও!
এই যে!
তাড়াতাড়ি!
ইতিমধ্যে···
সব ঠিক আছে। তোমরা যেতে পারো।
টিনটিনের কী হবে?
বাবেলের লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।
বাবেল শেখের আস্তানার হদিস পেলে এক লাখ টাকা পুরস্কার মিলবে, বুঝলে?

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫			■	
■	৬		■	৭	৮	■
৯		■	■	■	১০	
■	১১	১২	■	১৩		■
১৪	■	১৫			■	১৬
১৭			■	১৮		

সংকেত: পাশাপাশি: (১) অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ, পৌরাণিক যুগে যুদ্ধে ব্যবহৃত হত। (৩) বিদ্যুৎ। (৫) অশোকবনে সীতার সঙ্গিনী। (৬) আমাদের প্রধান খাদ্য। (৭) তাঁতে কাপড় বুনতে গেলে এটি দরকার। (৯) টাকা, অন্য অর্থে মজবুত। (১০) নির্বিষ সাপ। (১১) জীবজন্তুর অস্ত্র। (১৩) প্রাচীন ভাষা-বিশেষ। (১৫) লক্ষ্য। (১৭) মস্তিষ্ক। (১৮) ফুলের বাগান।

উপর-নীচ: (১) মৌমাছি। (২) বিখ্যাত ভারতীয় বোলার। (৩) বাজনা-বিশেষ। (৪) কদমফুল বা গাছ। (৬) আঁকার কাজ। (৮) কুয়াশা। (১২) খনিতে যা পাওয়া যায়। (১৩) পৃথিবী-বিখ্যাত খাল। (১৪) মৌচাকে থাকে। (১৬) পাণ্ডবদের বিশেষণ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

সো	পা	ন	■	জ	ল	জ
ম	■	বী	■	ছু	■	ল
দে	■	■	■	■	■	পা
ব	সু	ধা	■	বা	লা	ই
ভ	র	■	আ	■	সা	গু
ট্ট	■	বা	হ	ক	■	ড়ি
■	কা	বা	ব	চি	নি	■

ধাঁধা

ছোট্‌কার হাতের বিরাট মোটাসোটা বইটা মুখের অনেকটাই ঢেকে রেখেছে, শুধু দেখা যাচ্ছিল কানের পাশে চশমার সরু ডাঁটি। শরীরটা এলানো আরাম-কেদারায়, পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো মাঝে-মাঝে মুড়ে নিচ্ছে ছোট্‌কা—একটু তাকালেই ধরা যায়। ছোট্‌কা যখন রসিয়ে কোনও বই পড়ে, তখনই এমন একটা দৃশ্য তৈরি হয়। আমি ঘরে ঢুকছি, দরজার কড়ায় আচমকা হাতটা ঠেকে গেল। ছোট্‌কার কানে নিশ্চিত পৌঁছে গেছে কড়ার

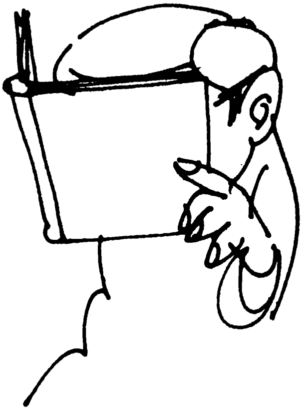

শব্দটা। আমাকে দেখে বইটার মাঝখানে একটা বাসের টিকিট ঢুকিয়ে বন্ধ করে রাখল পাশে। তারপর বলল, "ও তুই, আমি ভাবলাম খোলা দরজায় কড়া নাড়ল কে!"

আমি কিছু বলার আগেই ছোট্‌কা অনেকটা ফেলুদার কায়দায় বলে উঠল, "দরজার কড়ায় আঙুল ঠেকে গিয়েছিল—এই তো?" বলে হো-হো করে হেসে উঠল আপন মনেই, তারপর বলল, "প্রভাত মুখুজ্যে পড়ছিলাম। দারুণ। সতু তুই 'হর্নস অব এ ডিলেম্যা' মানে বলতে পারিস?"

শুনিইনি কথাটা, কী বলব। ছোট্‌কা বলল, "উভয়সঙ্কট। কাটাকুটি খেলায় দেখিসনি?. যেখানেই গোল্লা দে আমি ঠিক জিতে যাব।"

তা অবশ্য ঠিক। ছোট্‌কার সঙ্গে কাটাকুটি খেললে জেতা দায়। এমনভাবে দুদিকে ফাঁদ পেতে রাখে যে, একটা সামলাতে গেলে, অন্যটা দিয়ে ছোট্‌কা জিতে যায়। ওটাকেই বলে বুঝি হর্নস অব এ ডিলেম্যা! এতক্ষণে মানেটা অনেকটা মাথায় ঢোকে।

ছোট্‌কা বলল, "দাঁড়া, একটা ধাঁধা বলি। তাহলেই বুঝবি উভয়সঙ্কট কাকে বলে। নে, লেখ।"

ছোট্‌কার এই ধাঁধাটাই এবারের প্রথম ধাঁধা।

এক বন্দীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। রাজা সেই বন্দীকে বললেন, "হয় তোমাকে গুলি করে মারা হবে অথবা তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। আমরা একটা শাস্তির কথা ভেবে রেখেছি। এবার তুমি তোমার দিক থেকে একটা সুযোগ পাবে। তুমি বলো, কী ভাবে তোমাকে মারব আমরা। তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাব। আর তোমার কথা যদি মিথ্যে হয়, গুলি করে মারব তোমাকে।"

বন্দীটি খুব বিচক্ষণ। একটুক্ষণ ভেবে সে এমন-একটা উত্তর দিল যে, রাজা উভয়সঙ্কটে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত বন্দীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। বলতে পারো, কী বলল, সেই বন্দী?

দ্বিতীয় ধাঁধা॥ একটা পুকুরে প্রতিদিন একটা পদ্মফুল আয়তনে দ্বিগুণ হয়ে বেড়ে যায়। পুরো পুকুরটা, দেখা গেল, চল্লিশ দিনে পুরোপুরি ঢেকে গেছে। পুকুরটা অর্ধেক ঢেকেছিল কত দিনে?

তৃতীয় ধাঁধা॥ শব্দটার জট ছাড়াও—

জ র ব ন্দা ক

গতবারের উত্তর॥ (১) আমার পকেটে সাত টাকা, ছোট্‌কার পকেটে পাঁচ টাকা।(২) জ্যান্ত লোককে কবর দেওয়ার কথা উঠছে কেন? (৩) গোলমরিচ।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ব্যাঙের ছাতার ফোটো   ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ লোটা-কম্বল সম্বল করে বনে যেতে হলে কোন পথে যাওয়া ভাল?
উঃ সম্বলপুর হয়ে।

প্রঃ কোন চাষের ভবিষ্যৎ আছে?
উঃ আখের।

প্রঃ চিড়িয়াখানায় কোন জন্তু পুষতে খরচ সব. চাইতে বেশি?
উঃ নিশ্চয়ই শ্বেত হস্তী।

প্রঃ রবীন্দ্রনাথের কোন বইয়ের সব পাতা ছেঁড়া?
উঃ ছিন্নপত্র।

সুসেন

মজার খেলা

এ-খেলাটা আসলে ম্যাজিক, তাই ম্যাজিকের মতো রহস্যময় করেই দেখাতে হবে। এর জন্য দরকার দুটো কলা আর একটা সরু আলপিন বা ছুঁচ।

তুমি করবে কী, খেলাটা দেখাবার বহু আগে থেকে একটা কলা নেবে। এবার ছুঁচ বা আলপিনটাকে কলার খোসার ওপর দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে এমনভাবে সোজাসুজি ঘুরিয়ে টেনে আনবে যে, কলাটা ভেতরে-ভেতরে টুকরো হয়ে যাবে, অথচ বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। এইভাবে একটু ফাঁক দিয়ে-দিয়ে মোট চারবার কলাটাকে কেটে রাখবে। মনে রেখো, খোসা যেন না কাটে, কেবল চার জায়গায় চারটে পিনের প্রায়-অদৃশ্য ফুটো থাকবে খোসাটায়।

এবার তুমি তৈরি। দুটো কলার মধ্য থেকে যেটাতে কারসাজি করে রেখেছ সেটা বন্ধুকে দাও, নিজে নাও ভাল কলাটা। এবার বলো, "আমি দূর থেকে চারবার আঙুল চালিয়ে তোমার হাতের কলাটাকে চার টুকরো করে দেব। তুমি পারবে?"

বলা বাহুল্য, বন্ধু পারবে না। এবার তুমি দূর থেকে রহস্যময়-ভাবে আঙুল চালাও চারবার, তারপর বন্ধুকে খোসা ছাড়িয়ে দেখতে বলো। দেখবে, বন্ধুর কী অবস্থা হয়। তুমি এবার তোমার হাতের কলাটাও ছাড়িয়ে ফেলো। এটা আস্ত রয়েছে। সুতরাং ম্যাজিকটা আরও জমবে। তাই না?

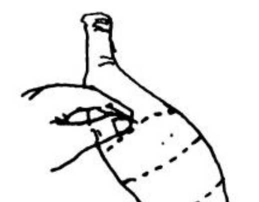

মজারু

হাসিখুশি

গোবিন্দবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, "ডালের বাটিটা নিয়ে যা। বাটিতে একটা মাছি ভাসছে।"

"সে কী বাবু!" ভৃত্য চিন্তামণি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "আমি যখন বাটিটা রান্নাঘর থেকে আনছিলাম তখন দেখলাম দুটো মাছি। এখন দেখছি একটা, তাহলে আরেকটা গেল কোথায়?"

রমেশবাবুদের নতুন লোকটি পুরনো কাজের লোকটিকে বলল, "জানো, বাবু আমার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন।"

পুরনো কাজের লোকটি অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি? কত বাড়ল?"

"আগে পেতুম হপ্তায় দশ টাকা। এখন দু' হপ্তায় কুড়ি টাকা।"

বুকুন জিজ্ঞেস করল, "মা, একটা মানিকের দাম কত?"

মা বললেন, "তা লাখখানেক তো হবেই।"

বুকুন খুশি হয়ে বলল, "তুমি তো বলো, আমি নাকি সাত রাজার ধন এক মানিক। তা আমাকে বাঁধা রেখে এখন একটা টাকা দেবে? ফুচকা খাব।"

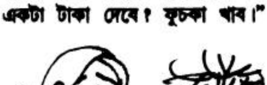

ভিখিরি আপনার কাছে কি চা খাবার মতো পয়সা আছে? এক পেয়ালার দাম হবে?

ভূদেববাবু: ধন্যবাদ। তোমার দিতে হবে না। আমি চালিয়ে নেব।

ছবি অহিভূষণ মালিক

Campa
Campa
Campa
CONTENTS 200 ML
ক্যাম্পার সঙ্গে
আমরা মাতি রঙ্গে
স্বাদে ও আনন্দে!
ক্যাম্পা অরেঞ্জ ফ্লেবার - স্বাদে ও আনন্দে!
OBM/5361

রাত্তিরে বনভোজন

আমরা তিন বন্ধু থাকি গ্রামে। একদিন ঠিক করলাম, রাত্তিরে বনভোজন করব। বাড়ির কাছেই একটা ছোট মাঠ, তারপর শুরু হয়েছে বনজঙ্গল। আমরা সেই মাঠেই বনভোজন করব। চাঁদা পড়ল মাথাপিছু পাঁচ টাকা।

খড় দিয়ে একটা নড়বড়ে ঘর তৈরি করলাম আমরা। রান্না হবে মাংস, ভাত আর ফুলকপি ভাজা। সন্ধেটা কাটল নানা জল্পনা-কল্পনায়।

রাত একটু বাড়তেই শুরু হয়ে গেল রান্নার আয়োজন। আমি আবার রান্নায় একেবারে অপদার্থ, বন্ধুরাই নিল সে দায়িত্ব। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, ঘরের মধ্যে টিমটিমে আলো, গ্রামের সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ মনে হল, ঘরের পেছনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে! একটু পরেই সেখানে সেখান থেকে বিকট শব্দ উঠল। ওই শব্দে আমার বুক কেঁপে উঠল। তাকিয়ে দেখি রান্নার জায়গায় বন্ধুরা নেই। আমি পড়ি-মরি করে এক দৌড়ে বাড়ি। আমাদের ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কাঁপছিল দুই বন্ধু। একটু পরে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তিন বন্ধু গেলাম বনভোজনের জায়গায়।

ওখানে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমাদের তিনজনেরই কান্না পেয়ে গেল। আসলে ভূত-পেতনি কিছুই নয়, বিকট শব্দ করেছিল কয়েকটা কুকুর। ওরা আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল। আমরা চলে যেতেই ওরা মহানন্দে বনভোজনে বসে গিয়েছিল। আমরা যখন ফিরে গেলাম তখন ওদের খাওয়া-দাওয়া প্রায় শেষ।

কানুরঞ্জন দে (বয়স ১৪)

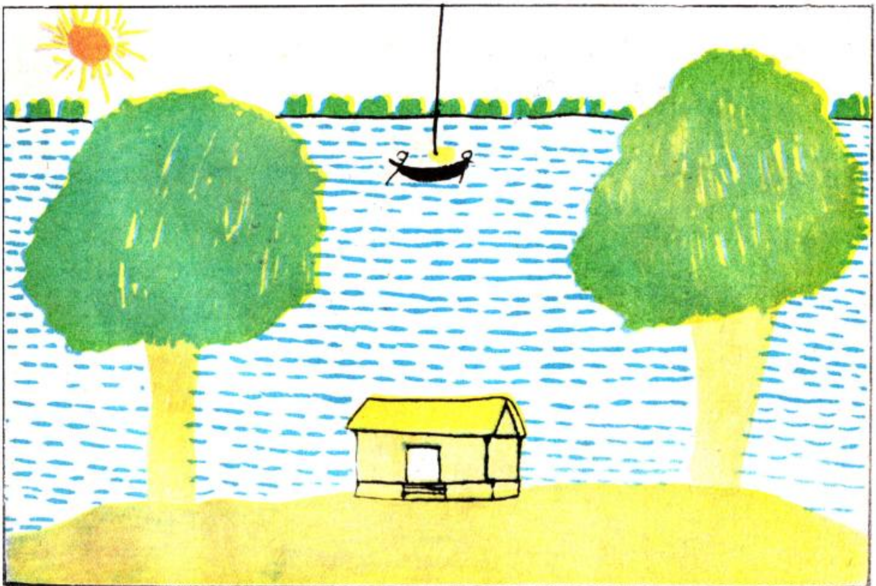

ছবি এঁকেছে নীলাব্জ সেন (বয়স ৮)

ছোটদের যত সেরা বই

সরলাবালা সরকারকে আমরা অনেকে কবি বলে জানি। কিন্তু কবিতার বই ছাড়াও ছোটদের জন্য তাঁর যে দারুণ চমক-জাগানো উপন্যাস রয়েছে সে-খবর কি রাখি? হ্যাঁ, সত্যিই দারুণ উপন্যাস সরলাবালা সরকারের 'পিন্‌কুর ডাইরি'। ছোট্‌কা একটা ছোট্ট ডাইরি উপহার দিয়েছিলেন কিশোর পিন্‌কুকে। পিন্‌কু করল কী, সেই খাতা ভরে লিখতে লাগল তার নিজের মনের কথা, আর লিখল সব কিশোরদের মনের কথা। পিন্‌কুর ডাইরিতে অজস্র চরিত্র, অগুনতি ঘটনা। চরিত্রগুলো যেমন কৌতূহল জাগায়, ঘটনাগুলোও তেমনই চমক-জাগানো।

আকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন যে-শঙ্করীপ্রসাদ বসু, তিনি ছোটদের জন্যও একটি দারুণ বই লিখেছেন, বইটি হল 'আমাদের নিবেদিতা'। নাম শুনলেই বোঝা যায়, বইটির বিষয় কী। কিন্তু বইটি হাতে না-নেওয়া পর্যন্ত যা বোঝা যাবে না, তা হল, নিবেদিতার সমগ্র জীবনকাহিনী কী আশ্চর্য ঝরঝরে ভাষায় গল্পের মতো করে বলেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু। পাতায়-পাতায় ছবি রয়েছে, সেই সঙ্গে এগিয়ে চলেছে নিবেদিতার জীবনের গল্প। ছোটদের তিনি যে ছোট বলে মনে করেননি তা বোঝা যায়, এই ছোট্ট বইটি লেখার পিছনে তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা ভেবে। উপহারের পক্ষেও দারুণ আকর্ষণীয় বইটির সামগ্রিক চেহারা।

ইন্দ্র মিত্রের বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৬ শরৎ কথামালা ১০ **সত্যজিৎ রায়ের** প্রোফেসর শঙ্কুর আজব অ্যাডভেনচার : প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৮ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬ মহাসংকটে শঙ্কু ৬ স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ৮ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫ কলকাতার রাজ-কাহিনী ৫ মৌমাছির রাজার রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **পাপু (সুব্রত সরকার)-র** পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ১০ **সংকর্ষণ রায়ের** গভীর গহন ৭ **পার্থসারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৫ মজার এক্সপেরিমেণ্ট ৫ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৬ রসায়নের ভেল্‌কি ৪ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত সহজ ছিল না ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশু-সাহিত্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ বনবিবির বনে ৬ **ননীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৬ যাদুঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৫ স্ট্রাইকার ৭ স্টপার ১০ কোনি ৭ ক্রিকেটের আইন কানুন ১০ খেলার যুদ্ধ ১২ **বিমল করের** ওআণ্ডার মামা ৭ কাপালিকরা এখনও আছে ৮ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১২

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

আমার নাম

আমার নাম সোনালি
আমি খুব খেয়ালি
যখন-তখন খেলতে যাই
আবার কখন পড়তে চাই
মনে পড়লে গান গাই
খোকন বলে দূর ছাই
সা রে গা মা করি তাই
লোকে বলে পালাই ভাই

সোনালি বসু (বয়স ৯)

অদ্ভুত পোকা

আমরা শিলংয়ে থাকি। একদিন বৃষ্টির রাতে শুতে গিয়ে দেখি বিছানার ওপর একটা কাঠি পড়ে আছে। কাঠিটাকে ফেলে দিতে গিয়ে দেখি, সেটা নড়েচড়ে উঠল। মা বলল, "কাঠি নয়, পোকা।"

তারপর সেটাকে ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট দিয়ে তুলে টেবিলের ওপর রাখলাম। তার ওপর জল দিতেই সেটা তিড়িং-বিড়িং করে নাচতে শুরু করে দিল। ওরে ব্বাবা! পোকার কী তেজ তখন! আমি সেটার নাম দিলাম জলকাঠি পোকা। ঘুমোবার আগে সেটাকে কাঠের থামের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম।

সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখলাম, পোকাটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। কিন্তু সকালে উঠে দেখি সেটা কখন দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে।

সৌত্রিক বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১০)

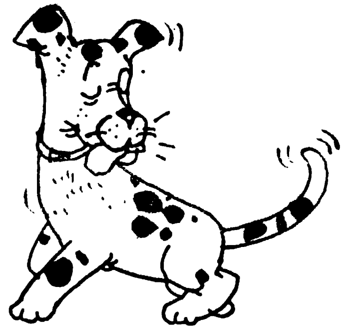

কুঁড়ে কুকুর

এক যে আছে কুঁড়ে কুকুর
বেগম তাহার নাম,
খায়-দায় ঘুমায় শুধু
নেইকো কোনো কাম।
চোরকে ধরা দূরের কথা
নিজেই করে চুরি,
তাকের থেকে কেক তুলে নেয়
টিনের থেকে মুড়ি।

চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৭)

দোলের দিন

দোলের দিন এল। আমাদের সবাই রঙ দিতে এল। আমার কী ভয়! যেই রঙ দিতে আসে অমনি আমি লুকোই।

কিছুক্ষণ পরে মায়ের বন্ধুরা এল মাকে রঙ দিতে। মাকে ভূত সাজাল। আমি তো মাকে চিনতেই পারি না।

মা চান করার পর মাকে চিনতে পারলাম।

নীপমঞ্জরী বর্মন (বয়স ৬)

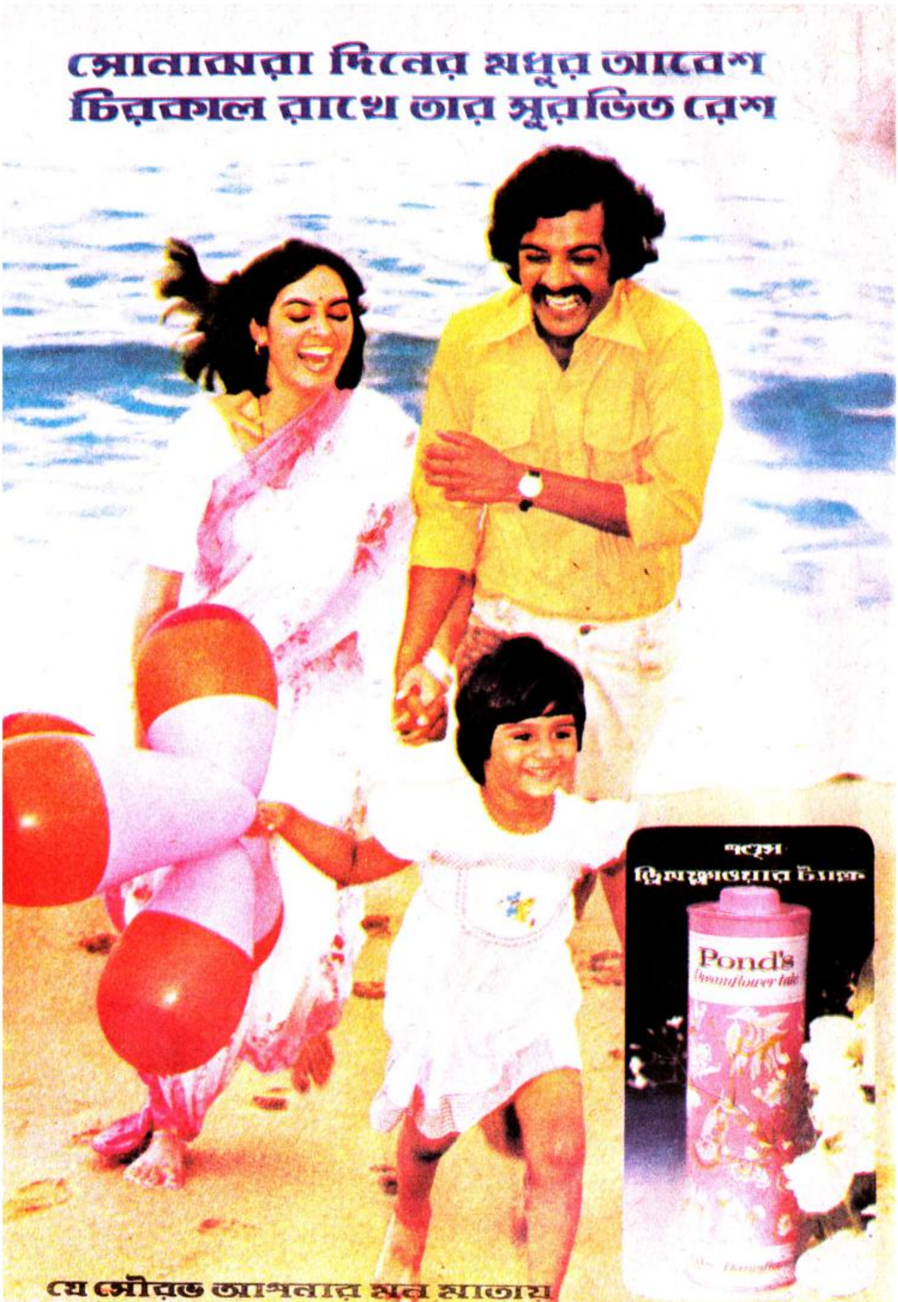
সোনাঝরা দিনের মধুর আবেশ
চিরকাল রাখে তার সুরভিত রেশ
পণ্ডস
ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক
Pond's
Dreamflower talc
যে সৌরভ আপনার মন মাতায়
HTM-PIL-2133

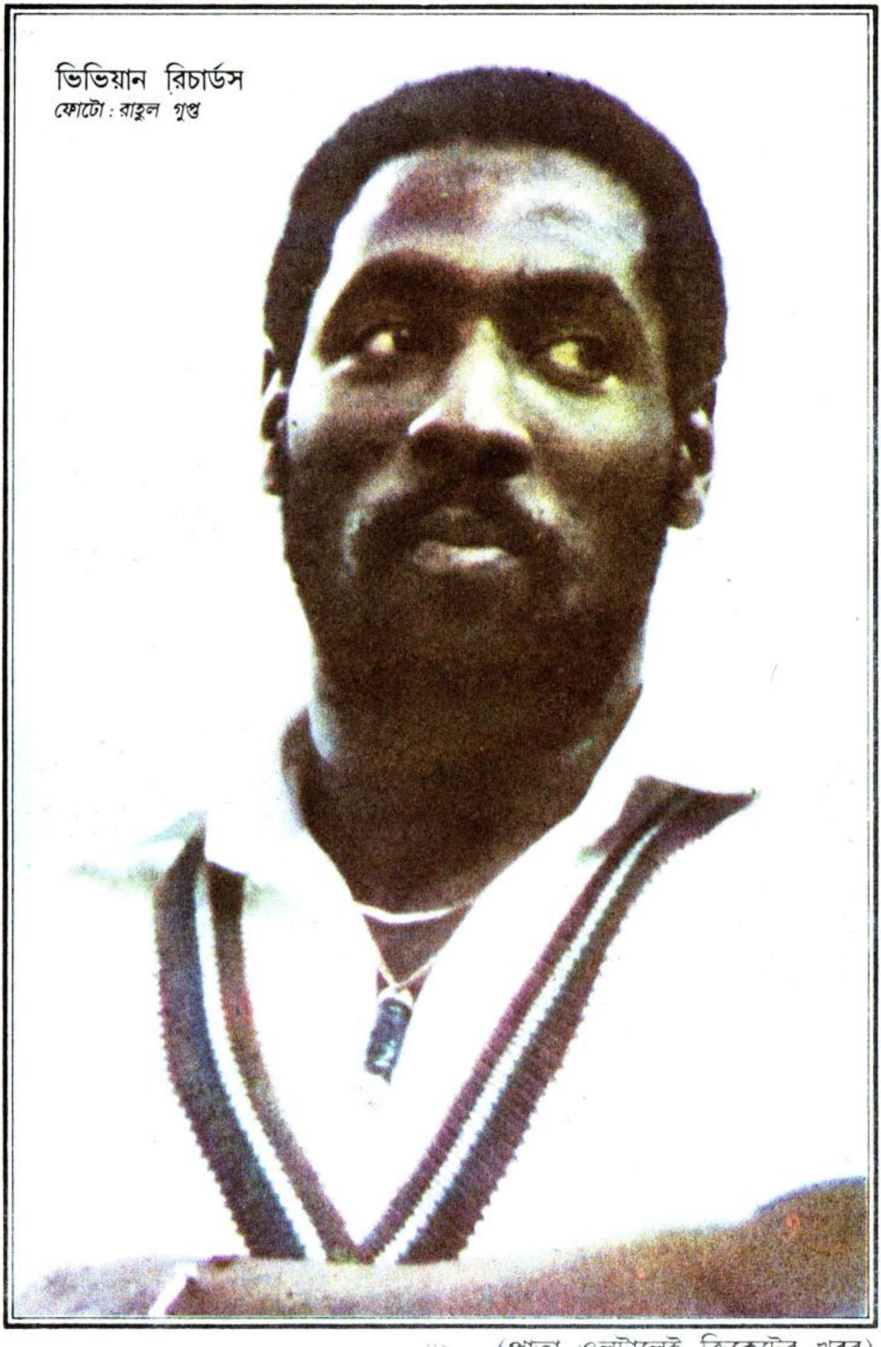

ভিভিয়ান রিচার্ডস
ফোটো : রাহুল গুপ্ত

 (পাতা ওলটালেই ক্রিকেটের খবর)

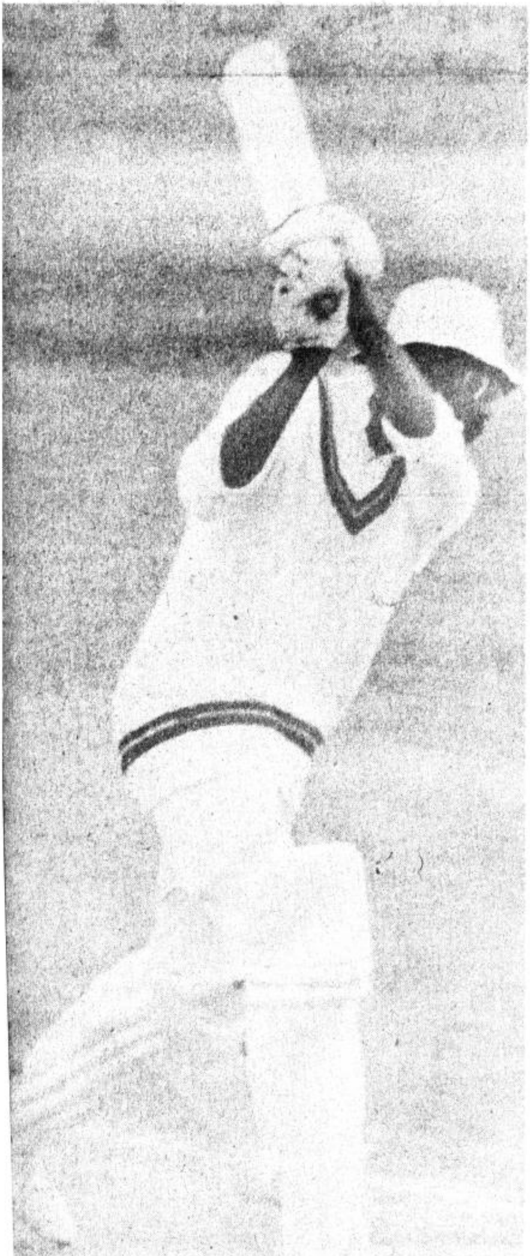

ক্লাইভ লয়েড

ওয়েস্ট ইণ্ডিজই সেরা

অরিজিৎ সেন

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আজ নিঃসন্দেহে বিশ্বের সেরা ক্রিকেট দল। কিছুদিন আগে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি খান পাতৌদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি দল গঠন করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে খেলানো যায়, কাদের জেতার সম্ভাবনা বেশি। উত্তর দিয়েছিলেন, "তাহলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ।"

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বরাবরই শক্তিশালী দল, শুধু প্যাকারের ওয়াল্‌ড সিরিজ ক্রিকেট যখন তুঙ্গে তখন ছাড়া। আর আজ তারা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যে-কোনো দলের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য অন্তত দুটি পৃথক এবং সমান শক্তিশালী দল গড়তে সক্ষম।

অতএব ইংল্যাণ্ড যখন এক নবগঠিত দল নিয়ে ক্যারিবিয়ানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল, বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে বললেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দিকেই পাল্লা ভারী।

হলও তাই। প্রথম টেস্টে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হল ইংল্যাণ্ডকে। দ্বিতীয় টেস্ট বাতিল হওয়ায় সরাসরি তৃতীয় টেস্টে মুখোমুখি হল দুই দল।

প্রথম টেস্টে বৃষ্টির জন্য অনেক সময় নষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত ইনিংস ও ৭৯ রানে ইংল্যাণ্ড পরাজিত হয়। তৃতীয় টেস্টে প্রথম দিকে কিছুটা আশা জাগিয়েও আবার হেরে যায়—এবার ২৯৮ রানে। পরপর দুটি টেস্টে হেরে যাওয়াতে অনেকেই বলেন যে, এমন দুর্বল দল নিয়ে আসা উচিত হয়নি।

তবে একথাও ঠিক, যে, ইংল্যাণ্ডের যে-দলটি ক্যারিবিয়ানে যায়, তা নবীন-প্রবীণের এমন সমাহার যে আগামী দশ বছর একটু রদবদল করে খেলে যেতে পারবে।

তৃতীয় টেস্টের গ্লানি মুছে চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্টে প্রাণপণ লড়াই করে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটাররা প্রমাণ করে দিল যে, তারা ফাস্ট

বোলিং-এর সম্মুখীন হতে সক্ষম। যে-দেশে এক-দুজন নয়, আটজন পেস বোলার আছে যারা সবাই পৃথিবীর যে-কোনো টেস্টদলে জায়গা পেতে পারে, সে-দেশের মাটিতে তাদের বিপক্ষে খেলতে যে অক্লান্ত সাহস আর পরিশ্রমী পারদর্শিতা প্রয়োজন, তা কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের সঙ্গে অল্পবয়সী নতুনরাও দেখাতে পেরেছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টে ইংল্যাণ্ড প্রমাণ করল যে, তারা আস্তে আস্তে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলিং-এ ধাতস্থ হচ্ছে।

তবে ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যও কিছুটা বিরূপ ছিল। সফরের প্রথম দিকেই উইলিস আহত হয়ে দেশে ফিরে যান। বদলি খেলোয়াড় রবিন জ্যাকম্যান ওয়েস্ট ইণ্ডিজে প্রথম পদার্পণেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন। তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য এমন স্তরে পৌঁছয় যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ঘোষণা করে, ইংল্যাণ্ড জ্যাকম্যানকে খেলালে তারা বাকি সফর বাতিল করে দেবে। শেষ পর্যন্ত গায়ানায় দ্বিতীয় টেস্ট খারিজ হয়ে যায়। অবশ্য সাব্যস্ত হয়, বাকি খেলাগুলি অন্যান্য জায়গায় নিয়মমাফিকই হবে। এরপরেই তৃতীয় টেস্টের সময় যখন ইংল্যাণ্ডের হাল খুব ভাল নয়, ঠিক তখনই তাদের প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং দলের ম্যানেজার কেন ব্যারিংটন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

এরপর কিন্তু ভাগ্য ইংল্যাণ্ডের সহায় ছিল। চতুর্থ টেস্টে প্রথম দিকে ভাল খেললেও শেষরক্ষা হত না যদি বৃষ্টি খেলার সময় অনেক কমিয়ে না দিত। পঞ্চম টেস্টে অবশ্য শেষ দিকে ইংল্যাণ্ড খুব ভাল ব্যাট করে প্রমাণ করে দেয় যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষেও রুখে দাঁড়ানো সম্ভব।

তবে সিরিজের শেষে এই দলকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। অনেকেই মনে করেন ইংল্যাণ্ডের এই হার অভূতপূর্ব। এত শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ নাকি এর আগে কখনও হয়নি। কিন্তু এই অভিমত ঠিক নয়। বরং বলতে হবে, ক্লাইভ লয়েড এবং ভিভিয়ান রিচার্ডসের মতো খেলোয়াড় নিয়ে যে-দল গঠিত তাদের বিপক্ষে খেলে ইংল্যাণ্ড প্রমাণ করেছে, আগামী দিনে তারা নিজেদের বিশ্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর।

গ্রাহাম গুচ

কিশোর পুত্র জোজোর সঙ্গে প্রবীণ জো লুই

বক্সিংয়ের বক্সার

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ডেট্রয়েটের সেই মোটর-কারখানার শ্বেতকায় ফোরম্যান যদি জোসেফ লুই ব্যারোর বিপিতাকে একটা ঘুসি না মারত, তাহলে বোধ হয় আমরা বক্সার জো লুইকে কোনোদিন পেতাম না। জোসেফের বাবার পোষ্য ছিল অনেক। অর্থাভাবের জন্যেই জোসেফকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের কর্মস্থলে একটি চাকরি যোগাড় করে দিলেন। খাটতেও পারত বটে জোসেফ! তিনজনের কাজ একাই করত। তাই তিনি ফোরম্যানের কাছে বলতে গিয়েছিলেন জোসেফের পদোন্নতির জন্যে। এবং তারই পুরস্কার ঐ ঘুসি। সঙ্গে-সঙ্গেই জোসেফ এর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলেও তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিরস্ত করল সকলে। এক যাজক বোঝালেন, সাদাকে আঘাত করেও কালো লিনচ্‌ড্‌ হবে না এমন জায়গা মার্কিন-মুলুকে একটাই আছে। বক্সিং রিং।

কথাটা বোধ হয় জোসেফের মনে ধরেছিল। তিনি বক্সারই হলেন। শুধু বক্সার নয়, সর্বকালের সেরা হেভিওয়েট বক্সারদের তালিকায় তাঁর নাম বাঁধা। 'রিং' পত্রিকা, ন্যাট ফিলশার সকলের 'সেরা' তালিকাতেই আলি বলেছেন, "সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্যাক জনসন, তারপর জো লুই, তারপর আমি।"

জো লুইয়ের দুটি রেকর্ড কেউ ভাঙতে

পারেনি। তিনি দীর্ঘ এগারো বছর আট মাস সাত দিন বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানের আসনটি দখলে রেখেছিলেন। এতদিন অন্য কেউ পারেনি। আর খেতাব বজায় রাখার জন্যে পঁচিশবার সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করেছেন—এদিক থেকেও তিনি অনন্য।

আর-একটি রেকর্ডও জো'র প্রাপ্য ছিল—যেটা রকি মার্সিয়ানোর আছে—অপরাজিত অবস্থায় অবসরগ্রহণ। আসলে জেমস ব্র্যাডককে হারিয়ে (২২ জুন ১৯৩৭) বিশ্বখেতাবটি একবার পকেটস্থ করার পর থেকে অবসরগ্রহণের দিন (১ মার্চ ১৯৪৯) পর্যন্ত তিনি হারেননি, খেতাবও হারাননি। তবে অর্থাভাবে তাঁকে বাধ্য হয়ে আবার রিংয়ে ফিরে আসতে হয়। পঞ্চাশ লাখ ডলার উপায় করলে কী হবে, আমেরিকার ফেডারাল ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ দেখালেন, তাঁর বারো লাখ ডলারের মতো কর বাকি। এটা শোধ করার উদ্দেশ্যেই দেড় বছরের মধ্যেই তিনি রিংয়ে ফিরলেন। কিন্তু বক্সিংজীবনের অপরাহ্নে এজার্ড চার্লসের (২৭ জুন ১৯৫০) কাছে পয়েন্টে হারলেন। কয়েকটি ছোটখাটো জয়ের পর রকি মার্সিয়ানোর সঙ্গে নক্‌ড্ আউট হলেন ২৬ অক্টোবর ১৯৫১। এর পরই তিনি তাঁর গ্লাভসকে বিশ্রাম দেন। সুতরাং বলা যায়, মার্কিন আয়কর দপ্তরই জো'কে একটি ন্যায্য রেকর্ড থেকে বঞ্চিত করলেন। পরে অবশ্য জো'র জনপ্রিয়তার চাপে বাধ্য হয়ে তাঁরা অনাদায়ী করের কিছুটা মকুব করেন, কিন্তু ততদিনে তাঁর যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে।

জো লড়েছেন মোট ৭১ বার, হেরেছেন মাত্র তিনবার। চার্লস ও মার্সিয়ানো ছাড়া তাঁকে হারাতে পেরেছেন শুধু জার্মান বক্সার ম্যাক্স স্মেলিং। স্মেলিং যখন লুইকে নক-আউট করেছিলেন (১৯ জুন ১৯৩৬) তখনও লুই বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হননি। চ্যাম্পিয়ান হয়েই লুই উত্তেজনার বশে বললেন, "গেট মি স্মেলিং।" ঠিক এক বছর বাদে (২২ জুন ১৯৩৮) দুজনের আবার সাক্ষাৎ ঘটল ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে। প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সংকল্প জো এক রাউণ্ডেরও কমে—মাত্র দু'মিনিট চার সেকেণ্ডে—ধরাশায়ী করলেন হিটলার-প্রেরিত

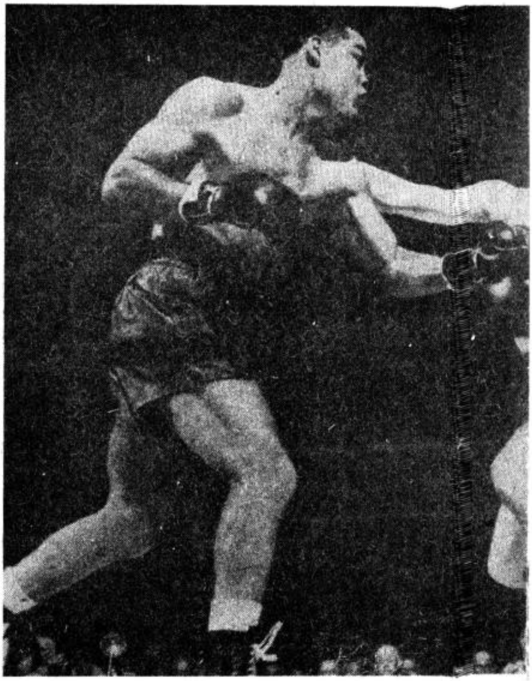

জো লুই, শতাব্দীর সেরা বক্সার

লড়িয়েটিকে। সত্তর হাজার লোকের চিৎকারকে ছাপিয়ে উঠতে চাইছিল আহত স্মেলিং-এর গোঙানি। তাঁকে রিংয়ের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় স্ট্রেচারে, জার্মানির জাহাজেও সেইভাবে!

বাংলার এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক এক প্রয়াত নেতা সম্পর্কে লিখেছিলেন—নিঃশত্রু নায়ক। জো লুই সম্পর্কে ঠিক ওই কথাই বলা যায়। বক্সিংয়ের জনপ্রিয় নায়ক জো সকলেরই প্রিয়জন ছিলেন তাঁর ব্যবহারের জন্যে। আমেরিকায় এমন কোনো বাড়ি নেই যার দরজা জো'র জন্যে খোলা ছিল না। এই লোকপ্রিয়তা আর কোনও বক্সারই পাননি। তাই জো মৃত্যুর (১২ এপ্রিল, ১৯৮১) ছ'দিন আগেও তাঁর সম্মানে আয়োজিত একটি সভায় দেড় হাজার লোক ছুটে গিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন রিংয়ের অনেক রথী-মহারথী।

জোসেফের জন্ম (১৩ মে ১৯১৪) আলাবামার লাফায়েত অঞ্চলে। বাবা ছিলেন

তুলো-খেতের গরিব ভাগচাষি। জোসেফের পিতৃদত্ত নামটা লম্বা মনে হওয়ায় ম্যানেজার জন রক্সবরো কাটছাঁট করে ওটাকে 'জো লুই' করে নেন। পেশাদার বক্সার হবার(১৯৩৪) কিছু দিন পরে যখন জো দ্বিতীয়বার লী র‍্যামেজকে হারান তখন থেকেই খবরের কাগজ তাঁকে 'ব্রাউন বম্বার' বলতে থাকে। 'ব্রাউন' বলার কারণ সম্ভবত তাঁর তামাটে রঙ। জো'র প্রশিক্ষক ছিলেন জ্যাক ব্ল্যাকবার্ন।

বহু খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধাকেই জো হারিয়েছেন—তালিকায় আছে সবচেয়ে লম্বা ও ভারী হেভিওয়েট বক্সার প্রাইমো কার্নেরা, ম্যাক্স বেয়ার, জার্সি জো ওয়ালকট, বিলি কন, টনি গ্যালেন্টো প্রমুখ। বেয়ারের সঙ্গে তিনি লড়েছিলেন বিয়ের দু'ঘণ্টা পর।

বক্সিংয়ের ব্যাপারে মহম্মদ আলিকে যদি অমিতব্যয়ী বলা যায়, তবে জো ছিলেন ঠিক তার উলটো। তিনি একটি ঘুসিও অকারণে খরচ করতে রাজি ছিলেন না। আলি যেখানে ঘুসিবৃষ্টি করবেন জো সেখানে একটি কি দুটির বেশি মারতেন না। কামারের এক ঘা আর-কি! তাঁর মতো লেফট জ্যাব আর কাউকে মারতে দেখা যায়নি। শেষ জীবনটা খুব কষ্টে কেটেছে জো'র। পেসমেকার লাগিয়েছিলেন ১৯৭৭ সালে বুকে অস্ত্রোপচারের পর। আর হুইল চেয়ারে বসেই জীবনের শেষ বছরগুলো কাটল।

তৃতীয়া স্ত্রী মার্থা তাঁকে অনেক সেবাযত্ন করেছেন। ওঁদের বাড়িটা স্প্যানিশ ধাঁচের, দশটা ঘর আছে তাতে। জো টিভি দেখতে খুব ভালবাসতেন বলে মার্থা বাথরুম সুদ্ধু আটটি ঘরে টিভি বসিয়েছিলেন, যাতে অশক্ত স্বামীর কোনও অসুবিধাই না হয়।

তবে তেমন বক্সিং হলে জো সেটা টিভিতে না দেখে হুইল চেয়ারেই চলে যেতেন রিংয়ের পাশে। মৃত্যুর দিন শেষবারের মতো অসুস্থ হওয়ার আগে তিনি গিয়েছিলেন সীজার প্যালেসে ল্যারি হোমস ও ট্রেভর বারবিকের খেতাবের লড়াই দেখতে। আমি শেষ পয়সাটি পর্যন্ত বাজি রেখে বলতে পারি, ঐ দুজনই এখন নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করছেন।

কলকাতাকে বাঁচাতে হ'লে

রাস্তার ভীড়ের কথা আর নতুন করে বলার কিছু নেই।

তবে কলকাতার জনসংখ্যা সম্পর্কে এবারের জনগণনায় একটা নতুন তথ্য জানা গেছে। সেটা হ'লো কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন বছরে ·৪ শতাংশ।

তার মানে বিভিন্ন রাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা রুজি রোজগারের জন্য কলকাতায় আসতেন তাঁরা এখন খুবই কম আসছেন। এই কম আসার অনেকগুলো কারণ আছে। কারণগুলোর মধ্যে একটা বড় কারণ হ'ল কলকাতা শহরের লোক সংকুলান ক্ষমতা তার সংপৃক্তি পয়েন্টে পেঁাছে গেছে। সোজা কথায় আর লোক নেবার ক্ষমতা নেই কলকাতার।

শহরের এই লক্ষণটা খুব একটা শুভ না হ'লেও আপাতত'র জন্য ভাল বৈকি। এই সময়ে যদি কলকাতার নাগরিক সুবিধে বা স্বাচ্ছন্দ্যগুলো (যেমন ঃ জল, রাস্তা—পরিবহন বাড়ি, নর্দমা, বস্তি-উন্নয়ন ও এলাকা উন্নয়ন ইত্যাদি) যদি আবার প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িয়ে নেওয়া যায় তাহ'লে বড় ভাল হয়। সেদিকে নজর রেখেই কাজ চালানো হচ্ছে।

তবে আর একটা কথাও আছে। একটা শহরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য শুধু কতকগুলো সংস্থাই তো দায়ী নয়। শহরের নাগরিকদেরও এবিষয়ে সচেতন হ'তে হবে। সচেতন হতে হবে কলকাতার অন্যান্য ভারী সমস্যাগুলো সম্বন্ধে। যেমন ঃ—শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং স্ব-নির্ভর আয়ের পন্থা ইত্যাদি। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি সবচেয়ে প্রয়োজন।

এসব নিয়ে আমাদের সকলেরই ভাবনা চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে।

জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ., ৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত।)

চীনা ভেলকি

চিরঞ্জীব

ফুটবল সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হলেও বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দেশ সম্ভবত টেব্‌ল টেনিসেই সর্বাধিক। একটি খেলায় এত দেশ একই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করে না।

এপরিলে যুগোশ্লাভ়িয়ার নোভিসাদে তেরো দিন ধরে ছত্রিশতম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা রেকর্ড করল। পুরুষদের দলগত খেলা সোয়েথলিং কাপে খেলল ৬৩টি দেশ, আর মেয়েদের দলগত খেলা করবিলন কাপে ৪৮টি দেশ। পুরুষ ও মেয়েদের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ছিলেন পাঁচ শ'রও বেশি খেলোয়াড়। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে নোভিসাদ শহর উৎসব-মুখর ছিল টেবল টেনিস ঘিরে। তবে প্রতিযোগিতা যত এগিয়েছে, উৎসব হয়েছে অন্য একটি দেশে। ইউরোপের একটি দেশে প্রতিযোগিতার আয়োজন ইত্যাদি নিয়ে উৎসব-আনন্দ। আর তার ফল নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিল আমাদের এশিয়ার দেশ চীন। চীনের খেলোয়াড়রা এবার যেরকম ভেলকি দেখিয়েছেন, বিশ্ব টেবল টেনিসের ইতিহাসে এমনটি ঘটেনি। প্রতিটি বিভাগের চ্যাম্পিয়ন খেতাবটি পেয়েছে চীন।

পুরুষ ও মেয়েদের দলগত খেতাব। আর ব্যক্তিগতভাবে জিতলেন পুরুষ সিঙ্গলসে—গুয়ো ইয়ে-হুয়া, মেয়ে সিঙ্গলসে—টং লিং। পুরুষ ডাবলসে—লি জেন-শি ও কাই জেন-হুয়া, মেয়ে ডাবলসে–জ্যাং ডাইং ও কাও ইয়েন-হুয়া। মিক্সড্‌ ডাবলসে—জাই সাইকে ও হ্যাং জুনা-কুন।

টেবল টেনিসে চীন কত উন্নত, তার আর একটি নজির—এবার ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার প্রতিটি ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে চীন বনাম চীন। অন্য কোনো দেশের খেলোয়াড়রা ফাইনালে উঠতেই পারেননি। এতদিন হাঙ্গারি, জাপান, সুইডেন,

পুরুষ-বিভাগে চ্যাম্পিয়ন গুয়ো ইয়ে-হুয়া

চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়দের নাম উঠত চীনাদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে। এবার থেকে আর সে-তর্ক করার অবকাশ রইল না। কথা উঠতে পারে—ভারত কী করছে। না, চীনাদের সঙ্গে ভারতের তুলনা চলে না। ভারত পঁয়ত্রিশ-তম বিশ্ব টেবল টেনিসে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং শহরে যা ফল করেছিল, এবার তার চাইতেও খারাপ করেছে। তবে বলার কথা—বিশ্ব টেবল টেনিসের ইতিহাসে ভারত এবারই প্রথম পদক পেল। মেয়েদের সান্ত্বনা সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতের বোমা শা হারান ম্যাকাওয়ের লো চো ফিনকে।

চীন এত এগিয়ে কীভাবে? নোভিসাদের ফল দেখে ১৯৭৩-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চীনের শি এন-টিং-এর কথা মনে পড়ছিল। ১৯৭৫-এ কলকাতায় তিনি বলেছিলেন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো অনেক খেলোয়াড় আছে আমাদের দেশে। শুধু তিন লাখ খেলোয়াড় রয়েছে সাংহাইয়ে। দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শরীর চর্চার মধ্যে টেবল টেনিসও আছে। এসব আমাদের কাছে স্বপ্ন।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে এক রকম গাছ পাওয়া গেল, তার ছাল ম্যালেরিয়া-রোগের ভাল প্রতিষেধক। গাছের নাম কুইনা-কুইনা। দারুণ চাহিদা তখন সেই গাছের ছালের। সুযোগ বুঝে ব্যবসায়ীরা তার মধ্যে আরেকটা গাছের ছালের ভেজাল দিতে লাগল। তার নাম সিংকোনা, দেখতে অনেকটা কুইনা-কুইনার মতো। কী আশ্চর্য! দেখা গেল সিংকোনার ছাল ম্যালেরিয়ার আরও ভাল প্রতিষেধক।

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী !

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্টে এমনই চমক্দার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে !

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝক্ঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী !

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন:

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি !

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.35-1810 BG

আগের কথা: শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আংটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, তার আসল পরিচয় কী? ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে রহস্যময় মানুষ সিংহীবাবু ও সুখিয়ার খবর পায়। প্রয়াগ ও সুখিয়া কি একই লোক! বংশীকে নিয়ে সিংহীবাবুর বাড়িতে ঢুকে শিশির দেখে, বাড়ি ফাঁকা। তারপর···

॥ ১৪ ॥

বংশীর দোকানে বসে শিশিরকে সব কথাই খুলে বলতে হল। না বলে উপায় ছিল না। এখানে বসে যদি খোঁজখবর করতেই হয় শিশিরকে, বংশী ছাড়া উপায় নেই। শিশির একা কতটুকু করতে পারে। আর বাবুদাকেও তো সে হাতের কাছে পাচ্ছে না।

কথা শেষ করে শিশির বংশীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

বংশীর চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। আকাশ থেকে পড়েছে যেন। কথা বলতে পারছিল না বংশী।

এমন সময় একজন ঢুকল দোকানে। হুঁশ হল বংশীর।

চেনা খদ্দের। গায়েমাখা সাবান, কনডেন্সড মিল্কের টিন, টুকটাক আরও কিছু কিনে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

দোকান ফাঁকা। বংশী বেশ বড় ডোজের টিপ নিল নস্যির। তার চোখ ছলছল করে উঠল। হাঁচল বার-দুই। রুমালে নাক পরিষ্কার করল। তারপর বলল, "তুমি তো দারুণ ফ্যাচাঙে পড়ে গেছ।"

শিশির চুপ করে থাকল।

বংশী আবার একবার নাক মুছে নিল। বলল, "দাঁড়াও, চা বলে আসি। খাবে কিছু? নিমকি? সেউভাজা?"

শিশির কিছু বলার আগেই বংশী দোকান ছেড়ে চলে গেল।

সামান্য পরে দোকানে ফিরে এসে বংশী বলল, "তুমি ঠিকই ধরেছ। তোমায় এখানে প্যাঁচ মেরে টেনে আনা হয়েছে।"

"তা তো বুঝছি! কিন্তু কেন?" শিশির বলল।

"মতলব আছে। আংটিটা হাতাবার জন্য হতে পারে।"

"কিন্তু কেমন করে জানবে যে আংটিটা আমি আনব! কলকাতা থেকে না-ও তো আনতে পারি।"

বংশী ভাবল। "আংটি তুমি আনোনি?"

"এনেছি।"

"বেশ করেছ।···এখন কী করা যায় বলো?"

"বুঝতে পারছি না। তুমিই বলো।"

"আমি বলব!" বংশী একটু মাথা চুলকে নিল। পরে বলল, "আমি বলব, প্রথমে আমাদের একবার থানায় যাওয়া দরকার। মিথ্যে টেলিগ্রামের ব্যাপারটা জানিয়ে আসা উচিত।"

"তাতে লাভ হবে?"

"হতেও পারে। বলেছি না, আমার চেনা লোক আছে থানায়।"

"তারপর?"

"সিংহিমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করা।"

"আমি যে-লোকটার কথা বলছি যদি সেই লোক আর সিংহিবাবু যদি এক লোক না হয়?"

"না হলে আর কী করা যাবে! তবে, তুমি যে-সময়ের কথা বলছ, মাসখানেকের বেশি হবে, সিংহিবাবুকে আমি দেখিনি। আমার মনে হয়, ভদ্রলোক এখানে ছিলেন না কিছুদিন। আবার ফিরে এসেছেন। সে খোঁজ আমি করে নেব। আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

শিশির কথা বলল না।

বংশী নিজে থেকেই বলল, "সিংহিবাবু বেশ খানিকটা অন্যরকম লোক। আমরা তাকে

পাগলা গোছের ভাবতাম। এখন দেখতে হবে, কেমন পাগল।”

এমন সময় চা এল। চায়ের সঙ্গে শালপাতার ঠোঙায় করে টাটকা সেউভাজা দিয়ে গেল ময়রার দোকানের ছেলেটা।

চা খেতে-খেতে বংশী বলল, “এই জায়গাটা বরাবর ভালই ছিল। আজকাল খানিকটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। চুরি-ডাকাতি হচ্ছে। তা ছাড়া, আমরা শুনেছি, কিছু খারাপ লোক আড্ডাও গেড়েছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিছুদিন আগে নদীর কাছে জঙ্গলে একটা খুনও হয়েছে।”

“খুন?”

“হ্যাঁ। যে খুন হয়েছিল সে এখানকার লোকই নয়। কে তাকে নিয়ে এল, কেন খুন করল ভগবানই জানেন।”

শিশির চা আর সেউভাজা খেতে লাগল।

বংশী বলল, “তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি পাত্তা লাগাচ্ছি। চোখকান খুলে রাখলে কোনো একটা হদিস পেয়ে যাব। বুঝলে?”

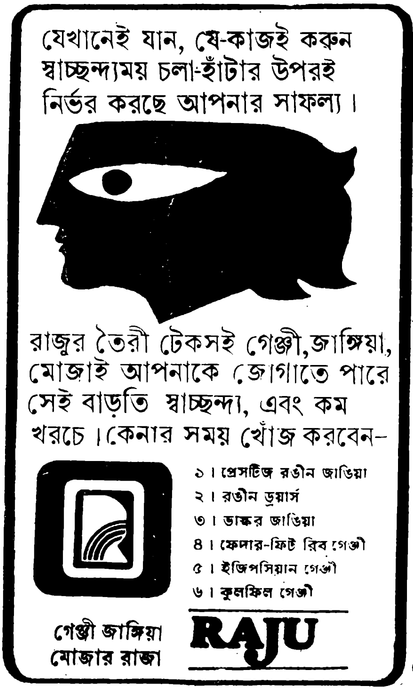

শিশির বলার মতন কিছুই পেল না, চুপ করে থাকল।

চা খাওয়া শেষ হল।

আরও একটু বসে থেকে শিশির উঠব-উঠব করছে, বংশী বলল, “বাড়ি গিয়ে করবে কী? বোসো।”

“রাত হলে পিসিমা ভাববে।”

“না, রাত করব না। তোমার কাছে আলো নেই। আমি তোমায় পৌঁছে দেব।”

“কী দরকার....”

দোকানে লোক ঢুকল আবার। মাঝবয়েসি ভদ্রলোক।

“বংশী?”

“ফটিকদা?”

“আমার সেই আয়ুর্বেদ মাজন আনিয়েছ?”

“কাল দেব।”

“তোমার কাল যে কবে শেষ হবে! দাও, চা দাও দুশো। আর একটা তেল দাও। নারকেল তেল। ছোট টিন। কই, ডিবেটা কোথায়?”

বংশী নস্যির ডিবে এগিয়ে দিয়ে চা ওজন করতে লাগল।

ফটিকদা নামের ভদ্রলোক নস্যি নাকে গুঁজে শিশিরকে দেখছিলেন। “ইনি কে?”

“আমার বন্ধু। শশধর বাবুর আত্মীয়।”

“ও! এখানে থাকেন?”

“না। কলকাতায় থাকে। বেড়াতে এসেছে।”

“ভাল।”

“ফটিকদা, আপনি আমাদের সিংহিবাবুকে দেখেছেন?”

“সিংহি! কোন সিংহি হে! এখানে আট-দশটা সিংহি। মোহন সিং, ভাগীরথ সিং, দ্বারকা সিং.... সিংয়ের রাজত্ব।” ফটিকবাবু নিজের রসিকতায় হাসলেন।

বংশী বলল, “না না, ওই রেলফটকের কাছে যিনি থাকেন। সিংহিমশাই। পাগলা-পাগলা মানুষ।”

“ও! প্রসন্নবাবুর কথা বলছ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখব না কেন?”

“আমি ভদ্রলোককে অনেকদিন দেখিনি। একটা দরকার ছিল।”

“উনি তো ছিলেন না এখানে।”

"তাই হবে। কোথায় গিয়েছিলেন হঠাৎ?"

"কলকাতায়।"

"ফিরলেন কবে?"

"ক-বে! এই তো সেদিন। দিন-চারেক আগে বোধ হয়।"

বংশী একবার শিশিরের দিকে তাকাল। চোখে-চোখে কথা বলার মতন দৃষ্টি।

চায়ের প্যাকেট বেঁধে দিয়ে বংশী নারকোল তেলের টিন পেড়ে নিল।

ফটিকবাবু পয়সা মিটিয়ে দিয়ে চলে যাবেন বংশী হঠাৎ বলল, "ফটিকদা, সিংহিমশাই কোথাকার লোক?"

দাঁড়ালেন ফটিকবাবু। "তা জানি না। তবে এদিককার নয়।" তারপর চলে গেলেন।

ফটিকবাবু চলে যেতেই শিশির বলল, "ভদ্রলোক কে?"

"গুডস্ ক্লার্ক। রেলফটকের কাছে বাঁ পাশে যে রেল কোয়ার্টারস আছে, সেখানে থাকেন। সিংহিবাবুর প্রতিবেশী একরকম।"

শিশির তাকিয়ে থাকল।

বংশী বলল, "এবার কী মনে হচ্ছে! মিলে যাচ্ছে না খানিকটা! সিংহিবাবু কলকাতায় গিয়েছিলেন, ফিরেও এসেছেন দু-তিন দিন আগে। তারপর তোমার নামে টেলিগ্রাম...।"

শিশিরও অবাক হচ্ছিল। সন্দেহ বাড়ছে বইকি।

বংশী বলল, "আমার ভাই বিশ্বাস, সিংহিবাবুর বাড়িতে কিছু-একটা হয়।"

"হয়? কী হয়?"

"তা বলতে পারব না। কেমন একটা লুকোচুরির ব্যাপার দেখলে না? বাড়ির বাইরে একরকম, ভেতরে একরকম! ভদ্রলোক করেন কী!"

"তুমি তো বলছিলে ওষুধপত্র দেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু উনি তো ডাক্তার কবিরাজ নন। টোটকা ছাড়েন।"

"আরও কী গুণ আছে বলছিলে—!"

"শুনেছি।...তা কাল আমরা প্রথমেই একবার সিংহিবাবুকে ধরব। কী বলো?"

"তুমি যা বলবে!"

"বেশ, কাল সকালে সিংহিবাবুর বাড়ি যাব।"

আরও খানিকটা বসে উঠে পড়ল বংশী। দোকান বন্ধ করবে।

শিশিরও উঠে দাঁড়াল।

"এখানে এক ধুরন্ধর আছে," বংশী বলল, "চোর-ছ্যাঁচড়ার খবরাখবর রাখে। নাম মহাবীর।"

শিশির কিছু বুঝল না।

বাইরে এসে দোকানে তালা দিতে-দিতে বংশী বলল, "তার কাছে প্রয়াগের খোঁজ নেব। আমি তো তোমার দু নম্বর লোকটাকে ধরতে পারছি না।"

দুজনে এবার হাঁটতে লাগল। স্টেশনের দিক দিয়েই যাবে।

বাজারের রাস্তা ধরে এগুতে এগুতে বংশী বলল, "আঙটিটা আমায় একবার দেখিও তো!"

ঘাড় নাড়ল শিশির। দেখাবে।

"আচ্ছা—" বংশী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। "কাল যদি তুমি আঙটিটা পরে সিংহির বাড়ি যাও কেমন হয়!"

"আঙটি পরে?"

"তোমার হাতে আঙটি দেখলে ভদ্রলোকের চোখমুখের ভাব কেমন হয় দেখা যেত। ঠিক কি না?"

শিশির ভাবল। বলল, "মন্দ হয় না। তবে ওই আঙটি পিসিমা আমায় পরতে দেবে না।"

"লুকিয়ে পরবে।"

"উপায় নেই। আঙটি এখন পিসিমার জিম্মায়।"

বংশী হতাশার শব্দ করল।

আবার হাঁটতে লাগল দুজনে।

খানিকটা এগিয়ে এসে বংশী বলল, "কিশোরদের বাড়িতে টর্চটা ফেরত দিয়ে আমি চলে যাব। তোমাকেও এগিয়ে দেওয়া হবে।"

শিশির কী একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ শুনল অন্ধকারে একটা সাইকেল হুড়মুড় করে তার ঘাড়ের কাছে চলে এসেছে। সরে যাবার জন্যে লাফ মারার আগেই শিশিরের ঠিক ঘাড়ের কাছে কী-একটা লাগল। বেশ জোরে। যন্ত্রণার শব্দ করল সে। সঙ্গে-সঙ্গে বংশী দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল সাইকেলঅলাকে। লোকটা রাস্তায় ছিটকে পড়ল। সাইকেল-সমেত। (ক্রমশ)

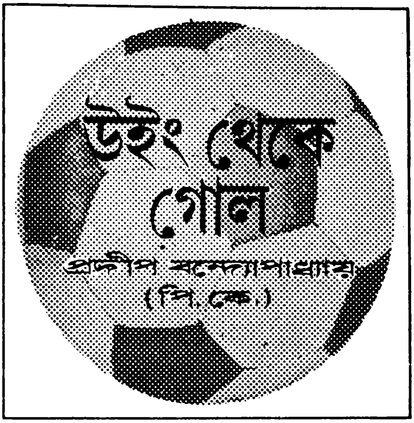

॥২১॥

মেলবোর্ন যাওয়ার দিন এগিয়ে এল। অলিম্পিক ফুটবলে নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করতে পারব কি না—এই চিন্তা মাঝেমাঝেই আসত। অবশ্য, ঢাকায় কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল এবং কলকাতায় চীনা দলের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে আন্তর্জাতিক ফুটবলের কিছুটা স্বাদ আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম।

চীনের জাতীয় দলের সঙ্গে খেলাটা নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। তখন আমি রেলের টিকিট কালেক্টর। সেদিন শিয়ালদহ নর্থ স্টেশনে ডিউটি করছি। গেটে দাঁড়ানো মানেই নানা ঝামেলা। মনটা একটু খারাপই ছিল। এমন সময় মোহিনীদা (মোহিনী ব্যানার্জি) এসে বললেন, "শুনেছিস কাণ্ড? আজ মোহনবাগান চীনা টীমের কাছে আট গোল খেয়েছে!"

এই সুযোগে মোহিনীদার কথা তোমাদের একটু শোনাই। এমন সহজাত প্রতিভা নিয়ে খুব কম ফুটবলার ভারতীয় ফুটবলে এসেছেন। তাঁর খেলায় ছিল বুদ্ধি এবং সৌন্দর্যের চমৎকার মিশ্রণ। ফুটবলার জীবনের প্রথম দিকেই এক দুর্ঘটনায় তাঁর একটি হাত অকেজো হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গে রেলের একটি খেলা খেলে ফিরছেন। ফার্স্ট ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। একটা হাত ছিল কামরার বাইরে। ঈশ্বরদি স্টেশনের কাছাকাছি এক জায়গায় লোহার পিলারে ধাক্কা লেগে সেই হাত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

অন্য কেউ হলে এই অবস্থায় খেলা ছেড়ে দিতেন। মোহিনীদা খেলে চললেন। আর সে কী চমৎকার ফুটবল! সামাদ সাহেবের মতো মানুষও নুর (সিনিয়র), অখিল আমেদ এবং মোহিনী ব্যানার্জির নাম একই সঙ্গে উচ্চারণ করতেন। বলতেন, এঁদের মতো হাফ আর দেখা যায়নি।

ইস্টার্ন রেলের টীমে একা মোহিনীদাই ফুলহাতা জামা পরে খেলতেন, অকেজো হাতটা ঢাকাই থাকত। অমন পায়ের কাজ আর বাঁ পায়ের শ্যুটিং কলকাতার ফুটবলে বেশি দেখা যায়নি। ফুটবল ছাড়াও ভাল খেলতেন ক্রিকেট আর টেনিস। তোমরা হয়ত জানো, মোহিনীদার উপযুক্ত সন্তান উদয়ভানু বাংলার ক্রিকেট-অধিনায়ক হয়েছে।

মোহিনীদার মুখে মোহনবাগানের আট গোল খাওয়ার খবর শুনে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। এত গোল তো মোহনবাগানকে কেউ কখনও দিতে পারেনি। সেন্টার হাফ সুভাষ সর্বাধিকারী একটা গোল শোধ করলেও, গোটা ম্যাচে মোহনবাগান নাকি দাঁড়াতেই পারেনি। চীনা টীম এত ভাল!

পরদিন সব পত্রিকায় চীনা দলের জয়গান প্রকাশিত হল। বাঘা সোমের মতো লোকও বললেন, সেই যে ইংল্যাণ্ডের ইসলিংটন করিনথিয়ান এসেছিল, এ টীম সম্ভবত তার চেয়েও ভাল।

মোহনবাগান টীম তো তখন যথেষ্ট শক্তিশালী। ফরোয়ার্ড লাইনে সাত্তারের সঙ্গে ছিলেন সমর ব্যানার্জি আর চুনী গোস্বামী। কেম্পিয়া ছিলেন। দুই ব্যাক শৈলেন মান্না আর সুশীল গুহ। পরের দুটি ম্যাচে চীনারা যে সহজেই মহমেডান স্পোর্টিং আর আই এফ এ একাদশকে হারাবে, তা নিয়ে কারো মনে কোনোরকম সন্দেহ ছিল না।

মহমেডান স্পোর্টিং প্রথম থেকেই রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে গোলের সংখ্যা বাড়তে দিল না। চীনা দল জিতল ৩—১ গোলে। মহমেডানের গোলটি এসেছিল পেনালটি থেকে।

আই এফ এ একাদশের সঙ্গে চীনা দলের খেলার আগের দিন বাঘাদা আমাকে উয়াড়ি টেণ্টে যেতে বললেন। খেলার ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দেবেন। উয়াড়ি টেণ্টে গেলেই বাঘাদা

আমাকে খাওয়াতেন টোস্ট আর ডাবল ওমলেট। টোস্ট-ওমলেট খেয়ে বাঘাদার পাশে বসলাম। উয়াড়ি ক্লাব ছিল ঢাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মিলনকেন্দ্র। বাঘাদা ছাড়াও পাখি সেনের মতো দিকপাল খেলোয়াড়রা আসতেন। ফুটবল নিয়ে কতরকম গল্প, আলোচনা হত। উয়াড়ি টেন্টে তখন আর একজন মাঝেমাঝে আসতেন—বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন রসিক লোক জীবনে আর দেখিনি।

চীনা দলের খেলা নিয়ে ভানুদাকেও খুব উত্তেজিত মনে হল। অননুকরণীয় ঢাকাই বাংলায় বললেন, "কাণ্ডা কী! মোহনবাগান আটখান গোল খাইল! আমরা পুরান মহমেডানের খেলা দেখছি, ডালহৌসি ইস্ট ইয়র্কের খেলা দেখছি, চীনা টীমে আছেডা কী? আরে তুমি····তোমারে চিনা-চিনা মনে হয়। খেলা দেখছি, তুমি তো পি কে ব্যানার্জি। আসো, তোমারে কিছু ট্যাকটিক্স শিখাই।" বাঘাদার অট্টহাসি উপেক্ষা করে ভানুদা বলে চললেন, "কাইল চীনাগো লগে যে খেলবা, কও দেখি, অগো উইক পয়েন্ট কই? তাইলে শোনো, অগো চোখ এক্কেরে ছোটছোট। সামনে আইলেই দিবা একটু কাতুকুতু। আমাগো বড়-বড় চোখ, হাসলে সামান্যই চোখ খোলা থাকে, অগো দেখবা চোখ একটুও খোলা নাই। তখন বল নিয়া মারবা দৌড়! বুঝছ?"

ভানুদার কথায় সবাই হাসলেন। বাঘাদা অবশ্য তারপর গম্ভীর হয়ে বুঝিয়ে দিলেন, পরদিন কী ভাবে খেলতে হবে।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় মাঠে বল বেশ দ্রুতগতিতে ছুটছিল। মিনিট দশেক বল আমাদের দিকে পেনালটি বক্সের কাছাকাছিই থাকল। বলতে গেলে, এই দশ মিনিট একা সনৎ শেঠই চীনাদের রুখে দিলেন।

হঠাৎ একটা বল ছিটকে আমার কাছে এল। দু'জনকে কাটিয়ে সেণ্টার করলাম, কিন্তু গোল হল না। হাফ টাইম হবার একটু আগে কিট্টু মুসার দিকে একটা চমৎকার বল বাড়ালেন। মুসা যখন বাঁদিকে বেশ দুরূহ কোণে বল ধরছেন, আমি ছুটে জায়গা নিয়েছি। ঐ জায়গা থেকে সেণ্টার করা ছাড়া উপায় নেই, সুতরাং আমি প্রস্তুত। মুসা কিন্তু গোলেই শট নিলেন।

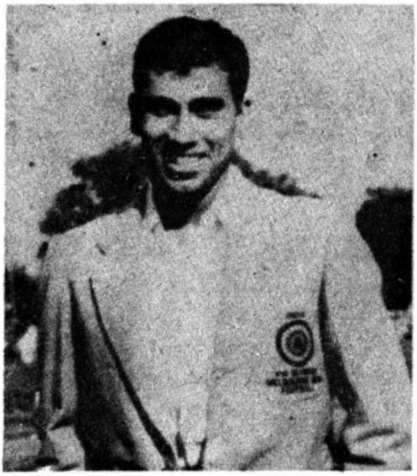

প্রদীপ, তখন

আর অবাক কাণ্ড, বল গোলে ঢুকে গেল। এই পাকিস্তানি উইঙ্গার কলকাতায় অনেক ভাল গোল করেছেন। তবে এই গোলটি সম্ভবত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গোল।

এই ম্যাচে আমাদের টীম ছিল এইরকম: সনৎ শেঠ, রহমান ও জোন্স, কেম্পিয়া, সুভাষ সর্বাধিকারী ও নিখিল নন্দী, প্রদীপ ব্যানার্জী, আমেদ খান, কে পাল, কিট্টু এবং মুসা।

দ্বিতীয়ার্ধে অধিনায়ক আমেদ খানের জায়গায় মাঠে নামলেন সাত্তার। সাত্তারদা আসতেই খেলার চেহারা পালটে গেল। কোনো সন্দেহ নেই, আমেদ খান বেস্ট ফুটবলার ছিলেন। কিন্তু আমি সাত্তারদার সঙ্গে খেলেই বেশি আনন্দ পেয়েছি। চমৎকারভাবে হলেও আমেদ খান বল বহুক্ষণ পায়ে রাখতেন। সাত্তারদা ছিলেন আপ্পা রাওয়ের মতোই নিঃস্বার্থ ইনসাইড ফরোয়ার্ড। খুব তাড়াতাড়ি দারুণভাবে বল ছেড়ে দিতেন।

দ্বিতীয়ার্ধে অন্তত দশবার চীনা দলের পেনালটি বক্সে ঢুকলাম। উইং দিয়ে গোল লাইনে পৌঁছেছি অন্তত পাঁচবার। আমার সেণ্টার থেকে হেড করে দ্বিতীয় গোল করলেন কিট্টু।

সাত্তারদার কাছ থেকে বল পেয়ে দু'জনকে কাটিয়ে তৃতীয় এবং শেষ গোলটা আমিই করলাম। ডান পায়ের শটটা ধরার কোনো

CHAITRA-G-137 BEN

উপায়ই ছিল না। এই চীনা গোলকীপার সদ্যসমাপ্ত বুখারেস্ট যুব উৎসবে সেরা গোলকীপার নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেখানে রুশ গোলকীপার লেভ ইয়াসিনও খেলেছেন।

দর্শকদের আনন্দিত এবং বিস্মিত করে আমরা ৩—০ গোলে জিতে গেলাম। মাঠ থেকে বেরোবার মুখেই বাঘাদা জড়িয়ে ধরে বললেন, "প্রদীপ, এত ভাল খেলা আমি বোধহয় কখনও দেখিনি। কিন্তু এমন স্বার্থপরের মতো খেললে কি ফুটবল খেলা যায়? তুমি আজ যা খেলেছ, আই এফ এ সাত গোলে জিততে পারত। কিন্তু……।" সামাদ সাহেব আর বাঘাদা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই উপদেশ দিলেন। এরপর থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, যাতে অন্যদের দিয়ে গোল করানো যায়।

বোম্বাই থেকে সবাইকে দিল্লি যেতে হল, সেখান থেকেই অলিম্পিক টীম মেলবোর্ন যাবে। হকি টীম অবশ্য আগেই চলে গিয়েছিল।

তখনকার সেরা বিমানে চড়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। সারা রাত উড়ে ভোরে সিঙ্গাপুর পৌঁছলাম। সিঙ্গাপুরে কিছুক্ষণ বিরতি, জ্বালানি নেওয়ার জন্য। সিঙ্গাপুর থেকে জাকার্তা। জাকার্তায় আর থামলাম না, প্লেনেই থাকলাম। এতক্ষণের জার্নি, গোঁ-গোঁ আওয়াজ, তখনও কানে তুলো দিতে শিখিনি। তবু সকলেই হাসিখুশি ছিলাম। শুধু রহিম সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একই বিমানে চলেছেন এম দত্তরায়, জিয়াউদ্দিন, শেফ দ্য মিশন অর্জন সিং।

জাকার্তা থেকে ডারউইনে এসেই দেখি প্রচণ্ড গরম। অবশ্য সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে হয়নি। পরদিন ভোরে সিডনি পৌঁছে গেলাম। চমৎকার আবহাওয়া।

কিন্তু রাস্তাঘাট এমন ফাঁকা কেন? সকাল ৯'টাতেও দেখি কোনো লোকজন নেই পথে। ঝকঝকে রাস্তায় দুএক টুকরো কাগজ উড়ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ছুটির দিন, তাই সকলেই শহর ছেড়ে আট-দশ মাইল দূরের মেরিনা বীচে চলে গেছে। হাতে সময় ছিল। আমরাও মেরিনা বীচের দিকে রওনা হলাম। যাবার পথে নেভিল ডিসুজা একটা কাজই করে গেলেন—নিখিল নন্দীর পিছনে লাগা।

(ক্রমশ)

সাহসী কাক

সুকুমার সিংহরায়

ঘরের মধ্যে বন্দী থাকা অসহ্য ব্যাপার। অথচ পিকলুকে বন্দী থাকতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই। পাঁচ-পাঁচদিন তার শরীরে জ্বর ছিল। জ্বর বেড়েছিল, কমবার নাম ছিল না। বাবা-মা দারুণ দুর্ভাবনা নিয়ে তাকে ঘিরে বসে ছিলেন। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, পিকলুর দু'চোখ টেনে টেনে চোখের পাতা দেখেছিলেন। হাতের নাড়ি দেখেছিলেন হাত ধরে। টেলিস্কোপ লাগিয়ে বুক, পিঠ পরীক্ষা করেছিলেন। সব শেষে ব্যাগ থেকে প্যাড বের করে কলম চালিয়ে খসখস করে পেসক্রিপশন লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন।

ঘরে থাকা যে অসহ্য, সে-কথা পিকলু কাউকে বলতে পারেনি। শুধু ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আমি কবে ভাল হব ডাক্তারবাবু?"

পিকলুর মাথার কোঁকড়া চুলে বিলি কেটে আশ্বাস দিতে গিয়ে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, "আমি যা ওষুধ লিখেছি, ওগুলো সব নিয়ম-মতো খেলে খুব শিগগিরই ভাল হয়ে যাবে তুমি। নিয়ম-মতো খাবে তো?"

একের পর এক পিকলু ওষুধ খেয়েছে। নিয়ম-মতো। ভাল হয়নি। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছে তবু। ডাক্তারবাবু সেই এক আশ্বাসের কথা শুনিয়ে গিয়েছিলেন পিকলুকে। এইভাবে চারদিন কেটেছিল।

পাঁচদিনের দিন ডাক্তারবাবু নিজেই হাসি-হাসি মুখ করে বলে উঠলেন, "এই তো তোমার জ্বর কমেছে। তুমি কেমন ভাল হয়ে গেলে।"

"ডাক্তারবাবু, এইবার আমি রাস্তায় যেতে পারব? খেলার মাঠে?"

"পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। জ্বর ছেড়েছে, এখন শরীর তোমার খুব দুর্বল। আর ক'টা দিন লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘরে বিশ্রাম নিয়ে তারপর বাইরে যাবে, কেমন?"

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে পিকলুর খুব আনন্দ হতে লাগল। সে ভাল হয়ে গেছে এবার। আর কয়েকদিন পরেই সে বাইরে যেতে পারবে। কতদিন সে বাইরে যায়নি। পাঁচদিন নয়, যেন পাঁচ বছর।

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে...

এমন, যা নজরে পড়ে!

হাই পাওয়ার সার্ফে আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধূলোময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা!

তাই তো, বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

লিনটাস-SU-225-1810 BG

এক সময় সে উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালার ধারে। রেলিংয়ে হাত রেখে তাকিয়ে দেখল, খেলার মাঠটা নির্জন। গ্রীষ্মের দুপুর। কাঠফাটা রোদে মাঠটা খাঁ-খাঁ করছে। মাঠের দক্ষিণকোণের অশ্বত্থ গাছটার নীচে বিশ্রাম নিচ্ছে কয়েকজন মানুষ। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাবার পরই পিকলুর চোখ আটকে গেল, পিয়নকাকুর ওপর। মাঠের ওপর দিয়ে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে পিয়নকাকু হেঁটে আসছেন। রোদ বাঁচাতে ছাতা ধরে রেখেছেন মাথার ওপরে।

পিয়নকাকুকে পিকলু চেনে। একদিন তাদের বাড়িতে বাবার মনি-অর্ডারের টাকা নিয়ে এসেছিলেন। সেই সময়ে আলাপ হয়েছিল পিকলুর সঙ্গে। পিয়নকাকু বলেছিলেন, "খোকাবাবু, তোমার নামে আমিও একদিন টাকা নিয়ে আসব।"

"কবে আসবে কাকু?

"তুমি যখন বড় হয়ে নিজের নাম সই করতে শিখবে, তখন—"

"কাকু, আমি তো নিজের নাম সই করতে শিখেছি।"

"তাই নাকি? লিখে দেখাও তো দেখি!"

পিকলু তার খাতাতে নিজের নাম সই করে দেখিয়েছিল।

পিয়নকাকু তাই দেখে বলেছিলেন, "খুব ভাল, খুব ভাল খোকাবাবু। তুমি যখন আরো সুন্দর করে নিজের নাম লিখতে শিখে যাবে, আমি তখন ঠিক বুঝতে পেরে তোমার নামে টাকা নিয়ে চলে আসব, কেমন?"

সেই থেকে পিকলু হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য প্র্যাকটিস করে প্রতিদিন। পিয়নকাকুকে দেখে পিকলুর সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

পিকলু তাকিয়ে ছিল পিয়নকাকুর দিকে। পিয়নকাকু কেমন মাঠ পেরিয়ে আসছেন দুলতে দুলতে। হাঁটা যেন পাল্কি চালানোর ছন্দ। পিয়নকাকুর সামনে কে যেন একটা ছেলে দৌড়ে এসে দাঁড়াল। পথ আটকে সে যেন কী বলতে চাইছে। কী বলতে চাইছে পিকলু জানলা থেকে কিছুই বুঝতে পারল না।

এবার ভয়ে পিকলু আঁতকে উঠল। ছেলেটা পিয়নকাকুকে মারছে। মাটিতে পড়ে গেছেন পিয়নকাকু। ছেলেটা এবার পিয়নকাকুর ব্যাগ ধরে টানাটানি করছে। ছেলেটা তবে কি গুণ্ডা? পিয়নকাকুর কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিতে চাইছে বোধহয়। তাই, তাই হবে। পিকলু একছুটে বাইরে বেরিয়ে যাবে কিনা ভাবছিল, পিয়নকাকুকে বাঁচাতে। ডাক্তারবাবুর কথা মনে পড়তে পিকলু আর যেতে পারল না। তাছাড়া মা-ও বকবেন এই সময়ে বাইরে বেরোলে।

পিকলু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে যেতে লাগল, পিয়নকাকু মাটিতে পড়ে চেঁচাচ্ছেন, "বাঁচাও, বাঁচাও!" গুণ্ডা ছেলেটা ওদিকে পিয়নকাকুর টাকা কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছে। গাছের নীচে বিশ্রামরত মানুষগুলো শুধু দেখে যাচ্ছে। অথচ কেউ তো ওরা ছুটে এগিয়ে আসছে না? কেন? কেন ওরা এগিয়ে আসছে না গুণ্ডা ছেলেটাকে ধরতে? ওদের সাহসের কি অভাব তাহলে?

সাহসী কি তবে সেইদিনের কাকগুলো? পিকলুর মনে পড়ছে। এই মাঠের, এই অশ্বত্থ গাছটার ওপর থেকেই একদিন একটা বাচ্চা কাক মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারেনি। সেই সুযোগে একটা বেনামী কুকুর তেড়ে এসেছিল কাকটাকে।

বাচ্চা সেই কাকটা শুধু চেঁচিয়ে উঠেছিল, কা-কা-কা শব্দ করে। অসহায় কাকটাকে দেখে পিকলুর খুব কষ্ট হয়েছিল সেদিন। তবু কুকুরটা কামড়াতে ছাড়েনি। অল্পক্ষণের মধ্যেই অসহায় কাকটার চিৎকার শুনে কাতারে কাতারে কাকেরা মিছিল করে ছুটে এসেছিল। তারপর কা-কা-কা বিকট চিৎকারে আর উড়ন্ত ছোঁ মেরে কুকুরটাকে মাঠের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। অসহায় সেই বাচ্চা কাকটা রক্ষা পেতে পিকলুর কী আনন্দই না হয়েছিল সেদিন।

পিকলু দেখল, পিয়নকাকু মাটিতে পড়ে আছেন। মাথায় খুব লেগেছে বোধহয়। কেউই আসছে না পিয়নকাকুকে তুলে দাঁড় করাতে। কেন আসছে না? পিকলুর মনে হল ঐ গাছের নীচের মানুষগুলো ভিতু, স্বার্থপর। কাকেদের মধ্যে যে মিলমিশ রয়েছে মানুষের মধ্যে তা নেই কেন? ভেবে কষ্ট পেল পিকলু।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

প্রবীর ঘোষ

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বিদ্যালয়টির নাম 'নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন'। অনগ্রসর সুন্দরবনাঞ্চলের মানুষের কল্যাণের জন্য তথা অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের উন্নতির জন্য বর্তমান আশ্রম-সম্পাদক স্বামী বুদ্ধানন্দজি মহারাজ জয়নগর-মজিলপুরের কাছে নিমপীঠে আসেন ১৯৬১ সালে। কলকাতার এক গুজরাতি ভদ্রলোক শ্রীপ্রভুদাস ভাই জে-শাহর কাছ

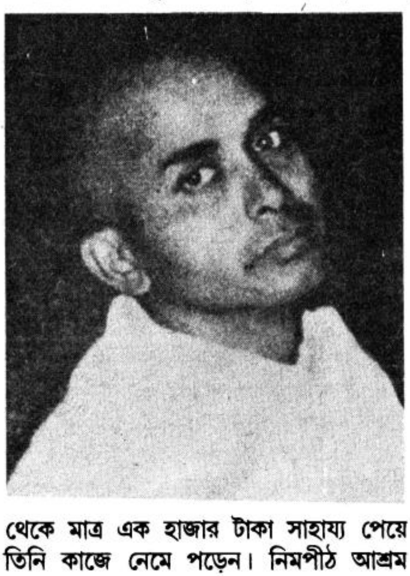

থেকে মাত্র এক হাজার টাকা সাহায্য পেয়ে তিনি কাজে নেমে পড়েন। নিমপীঠ আশ্রম ক্রমে বড় হচ্ছে। আশ্রমের হাতে এখন নানান কল্যাণমূলক কাজ। তারই একটি হল এই 'নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন' স্কুলটি।

শুধুমাত্র সুন্দরবন বা দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মধ্যে নয়, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয় এটি। '৬৭ সাল থেকে স্কুলটি নবম শ্রেণী খোলার অনুমতি পেয়েছিল এবং স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ছাত্রদের পাঠানো হয়েছিল ১৯৬৯ থেকে। স্কুলের গত দশ বছরের ফলাফল বেশ ভাল। পাঁচ বছর ১০০ পারসেন্ট-ই পাস, বাকি বছরগুলিতে পাসের হার ৯০ পারসেন্ট-এর বেশি বা কাছাকাছি। গত বছর পাসের হার ছিল ৯১·৩ %। শতকরা পাসের হারই শুধু ভাল নয়, এই বিদ্যালয় থেকে একাধিকবার স্ট্যাণ্ড করেছে, অনেকবার জাতীয় মেধাবৃত্তিও পেয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে খুব দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্ররা বিনা বেতনে স্কুলে এবং বিনা খরচে আশ্রমের ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করবার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পায়। কেবলমাত্র ছেলেদের জন্য এই স্কুলটিতে সুন্দরবনাঞ্চলের আদিবাসী ও তপসিলি ছাত্রের সংখ্যাও বেশি। কথা প্রসঙ্গে এ-সব তথ্য জানালেন আশ্রমের তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী সদানন্দজী মহারাজ।

প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মচারী দীপেন মহারাজ '৬৭ সাল থেকে শিক্ষকতা করছেন, '৭৭ সাল থেকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। ফিজিকসে অনার্স হলেও উনি মুখ্যত ইংরেজি পড়ান। ফিজিক্যাল সায়েন্স ও অঙ্কের ক্লাসও নেন।

ইংরেজি প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী দীপেন বললেন, "ফোর থেকে ফাইভে এসে যারা ভর্তি হয় তারা তেমন কিছুই জানে না অর্থাৎ গোড়া থেকেই কাঁচা। মুখস্থবিদ্যাই তাদের আসল মূলধন। এই মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভর না করে, গ্রামারের ওপর নির্ভর করতে হবে এবং জোর দিতে হবে। গল্পের মাধ্যমে, মজার ছবির মাধ্যমে ইংরেজির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা উচিত। ইংরেজিতেই কথাবার্তা, চিঠি লেখা, ক্লাস হওয়া দরকার। ভুল হয় বা হতে পারে বলে বলব না, তা করলে চলবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু বকুনি দিলেও চলবে না, তাদের উৎসাহিত করতে হবে। ইংরেজির প্রতি ছেলেমেয়েরা যেন আকৃষ্ট হয়, ভয় না পায়। গ্রামার জানা দরকার, অনুশীলন করতে হবে এবং করেকশান করিয়ে লিখতে হবে। তাহলে ইংরেজিতে বেশি নম্বর

তোলা যাবে, ভীতিভাবও থাকবে না।

"অঙ্কেও প্রায় একই ব্যাপার। অঙ্ক তো লজিক। ফর্মুলা দেখে, উদাহরণ দেখে নিজে-নিজে অনুশীলন করুক। মিলছে না বলে ছেড়ে না দিয়ে একটা জেদ নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। প্রাকটিস করতে-করতে উন্নতি হবে এবং একবার মজা পেয়ে গেলে নিজেই আর ছাড়বে না তখন। জোর করে ওষুধ খাওয়ালে শেষ পর্যন্ত যেমন কাজ হয়, তেমনি জোর করে অঙ্ক করালেও কাজ হবে।"

ফিজিকাল সায়েন্স প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক জানালেন, "বিভিন্ন রকমের উদাহরণ ছবি দিয়ে দেখাতে পারলে এবং বাস্তবভিত্তিক হলে বোঝানোর পক্ষে খুবই সহজ হয়। ধরুন, তুলাদণ্ডের প্রত্যেকটি অংশ খুলে যদি দেখাতে পারি, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক বেশি মনে থাকবে।" জীবনবিজ্ঞান সম্পর্কে বললেনঃ "ছেলেদের লিখে আনতে বলা হয়, সঙ্গে-সঙ্গে সে-বিষয়ের ছবি এঁকে আনার কথাও বলতে হবে।'"

সাধারণ ছাত্রদের পাসের সহজ উপায় কী—এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বক্তব্যঃ ইংরেজির গ্রামার এবং কম্পোজিশনে একটু ভাল নজর দিতে হবে। অথবা টেক্সটের চল্লিশ নম্বরের ওপর বেশি গুরুত্ব দিক। ইতিহাস, ভূগোলের পয়েন্টের প্রতি এবং অঙ্কের জ্যামিতি ও কয়েকটা ফর্মুলা মুখস্থ রাখতে হবে। তাহলে শুধু পাস আটকাবে না।

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

চোদ্দ বছর বয়সি মুকুল সরকারের বাড়ি সুন্দরবনের গোসাবা থানার দক্ষিণ রাধানগর গ্রামে। মুকুল শতকরা ৭৮ নম্বর পেয়ে ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ উঠেছে প্রথম হয়ে। তার প্রধান প্রতিযোগী আব্দুল মালেক।

কোনো দিনই মুকুল গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েনি; এখনও পড়ে না। আশ্রমের হস্টেলে থাকে। হস্টেল-বাড়ির পাশেই মাস্টারমশাইরা থাকেন। নিজে যখন চেষ্টা করে পারে না, তখন তাঁদের কাছে যায়। মূলত অঙ্ক বিজ্ঞানেই সাহায্য নেয়।

নাইন থেকে টেন-এ ওঠার সময় অঙ্কে সবচেয়ে বেশি (৯৬) পেলেও মুকুলের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় জীবনবিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞান। দুটি বিষয়েই আশির বেশি নম্বর পেয়েছিল।

মুকুল ইতিহাস আর বিজ্ঞানে রেফারেন্স বই বেশি পড়ে। লেখার মধ্যে কোনো বিষয়ে ইংরেজি কোটেশন সাধারণত ব্যবহার করে না।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রিয় লেখক হলেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওর সবচেয়ে প্রিয়। আমার শেষ প্রশ্নের উত্তরে ফার্স্ট বয় জানালঃ "বাবা ডাক্তার হতে বলেন, আমি এখনও কিছু ভাবিনি।"

নরওয়ের বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার ইবসেন তাঁর জীবনের একটা ঘটনার কথা খুব মজা করে বলতেন। রোমে বেড়াতে গেছেন তিনি। রাস্তায় এক জায়গায় বড় বড় কতগুলো লাল পোস্টার টাঙানো, আর সেগুলোর সামনে লোকের ভিড়। ইবসেন ঠেলেঠুলে ঢুকলেন, কিন্তু পোস্টারগুলোতে কী লেখা আছে পড়তে পারলেন না, কারণ চশমাটাই হোটেলে ফেলে এসেছেন। পাশের একজনকে ইতালীয় ভাষায় বললেন, "সিনর, লেখাগুলো একটু পড়ে দেবেন, আমি চশমা আনতে ভুলে গেছি।" ইতালীয় লোকটি ইবসেনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "দুঃখিত সিনর, আমিও আপনারই মতো নিরক্ষর।"

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

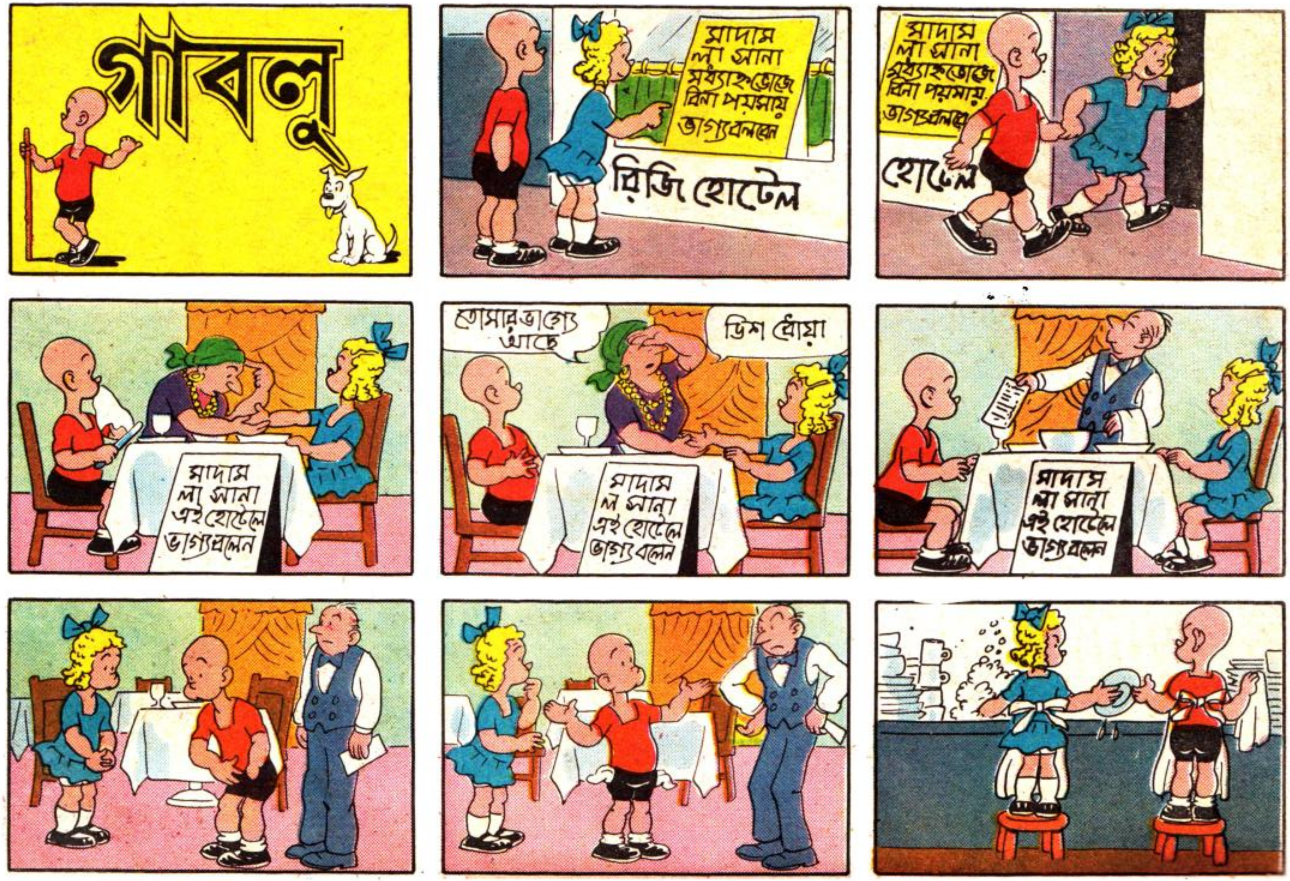
গাবলু
মাদাম লা সানা সর্ব্যাহ্ণভোজে বিনা পয়সায় ভাগ্যবলবেন
রিজি হোটেল
মাদাম লা সানা সর্ব্যাহ্ণভোজে বিনা পয়সায় ভাগ্যবলবেন
হোটেল
মাদাম লা সানা এই হোটেলে ভাগ্যবলেন
তোমার ভাগ্যে আছে
ডিশ ধোয়া
মাদাম লা সানা এই হোটেলে ভাগ্য বলেন
মাদাম লা সানা এই হোটেলে ভাগ্য বলেন

মিশিপাখা শিখিপাখা

বাচস্পতি

ভণ্টু খেলতে বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে তিন্নির গলা এরই মধ্যে খানিকটা রেকর্ড করা হয়ে গেছে। হিগিনকাকু ক্যাসেট বাজিয়ে শুনছেন, আর একটা খাতায় কী সব লিখে রাখছেন। লেখার কয়েকটা ইংরেজি অক্ষর, আবার কিছু চিহ্ন ভণ্টুর অচেনা। সে খানিকক্ষণ কান পেতে শুনল, কিন্তু 'আ-গ্‌গা-আ-ঙ্গা-আ' ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই ক্যাসেটে। তা অত মন দিয়ে শোনার কী আছে? সে জিজ্ঞেস করল, "কাকু, এ তো কথাই নয়—এগুলো খামোকা রেকর্ড করলে কেন?"

হিগিনকাকু যেন ঠিক ধ্যান ভেঙে জেগে উঠলেন। বললেন, "হাঁ কর্‌ তো!"

ভণ্টু বেশ ঘাবড়ে গেল। হিগিনকাকু লেখাপড়ায় ডক্টরেট বলে সে শুনেছে, কিন্তু রোগের ডাক্তার তো নয়, এ-কথা বলছে কেন? তাছাড়া হাঁ করতে ভণ্টুর একটু অস্বস্তিও আছে। তার ওপর-পাটির মাঝখানের দুটো দাঁত একটু বড়সড়ো, স্কুলের বন্ধুরা এ জন্যে তাকে 'খরগোশ' বলে খ্যাপায়। তার বাবারও ঐ দুটো দাঁত বড় সাইজের, এজন্যে মা বলেন ভণ্টু পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছে। যাই হোক, এখন হিগিনকাকু তার গুরু, কাজেই সে ভয়ে-ভয়ে হাঁ করল।

"এবার বল্‌, তোর মুখের মধ্যে তুই কী দেখছিস!"

"বাঃ," ভণ্টু বলল, "আমার মুখ কি আমি দেখতে পাচ্ছি না কি?"

হিগিনকাকু নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা চাপড়ে বললেন, "ঠিক কথা। আসলে এখনও ঘুম ছাড়েনি আমার।" বলে, "বৌদি, আরেক কাপ কালো কফি" বলে হাঁক দিলেন, তারপর বললেন, "যা, একটা ছোট আয়না নিয়ে আয়।"

ভণ্টু ঠাকুমার ঘর থেকে কাঠের ফ্রেমওয়ালা একটা হাত-আয়না নিয়ে এল। হিগিনকাকু ভণ্টুর মুখের সামনে ধরলেন সেটা, তারপর বললেন, "এবার বল্‌ তো—

মিশিপাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে,
শিশিবোতল ছিপি-ঢাকা সরুসরু গানে গানে।"

সুবোধ ছাত্রের মতো কথাটা আউড়ে গিয়েই ভণ্টু ফিক করে হেসে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে মস্ত ধমক—"একদম হাসি নয় ভণ্টু! এখন তুমি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছ। এবার কী দেখলে?"

ভণ্টু ভয়ে-ভয়ে বলল, "দেখলাম কথা বলছি, আর আমার মুখ নড়ছে।"

হিগিনকাকু যেন অবাক হলেন, "ব্যাস, এই? মুখ নড়ছে? আর কিছু নয়? আচ্ছা শোন্‌, এবার ঐ লাইনদুটোই আরেকবার বল্‌। এবার কিছু গলায় আওয়াজ করবি না।"

"আওয়াজ করব না মানে?"

"মানে লাইনদুটো বলে যাচ্ছিস তুই, সবই করছিস্‌, কিন্তু শুধু আওয়াজটাই হচ্ছে না। নে, বল্‌।"

হিগিনকাকু আবার আয়নাটা ভণ্টুর মুখের সামনে তুলে ধরলেন।

(ক্রমশ)

রেলগাড়িতে

প্রসাদ

চম্বল ভাবছে, বেড়াতে বেরিয়েও সুখ নেই। একে তো মিলি অনবরত কানের কাছে বকবক করছে, তার ওপরে বাবা আবার বলে রেখেছেন, "চম্বল, সব কিছু ভাল করে দেখবে। মনে রাখবে। বাড়ি ফিরে ভ্রমণকাহিনী লিখতে হবে।"

There is so much to see.

Is it possible for anyone to remember everything?

So Chambal decided to write everything down.

But then he discovered that it's impossible to do so.

One has to pick and choose.

But it's not easy to decide what to write and what to leave out.

Take that man trying to get into the train.

He has his wife and five children and all that luggage to go into the train with him.

He has nobody to help him.

The children are too young to be of any real help.

The eldest son doesn't seem to be more than five or six years old.

Ought I to write about that man?

I suppose I ought to.

Chambal took up his pen and diary and began to write.

বাবা ততক্ষণ পর্যটন দপ্তর থেকে আনা কাগজপত্র দেখছিলেন।

The pamphlets were full of advice to tourists.

They told the tourists where to go.

They also told them where to stay at the different places.

There were lists of important tourist spots to visit.

There were even instructions about the charges to pay to the station porters.

Information was given about the

best seasons to visit the different places.

আর মা?

Mummy was taking care to see that the children didn't get cinder in their eyes.

Every now and then she was warning Milly not to put her head out of the window.

She was telling Chambal not to stand near the door.

And she was asking the children not to quarrel.

ট্রেন চলুক, আমরা লক্ষ করি:

There is so much to see.

There are tourist spots to visit.

There are charges to pay to the porters.

He has nobody to help him.

Mother was taking care to see that the children were safe.

She told them not to quarrel.

বাঘা

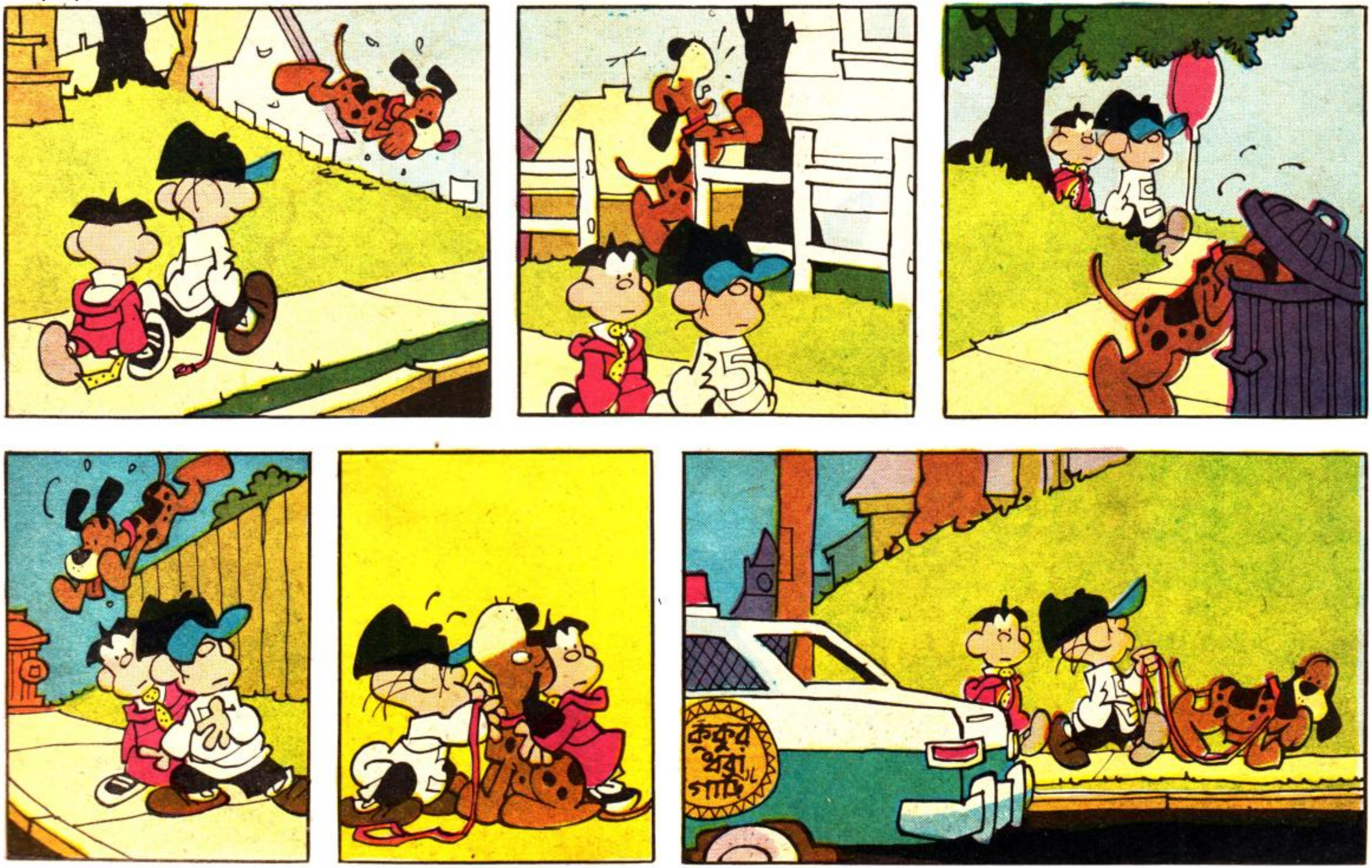

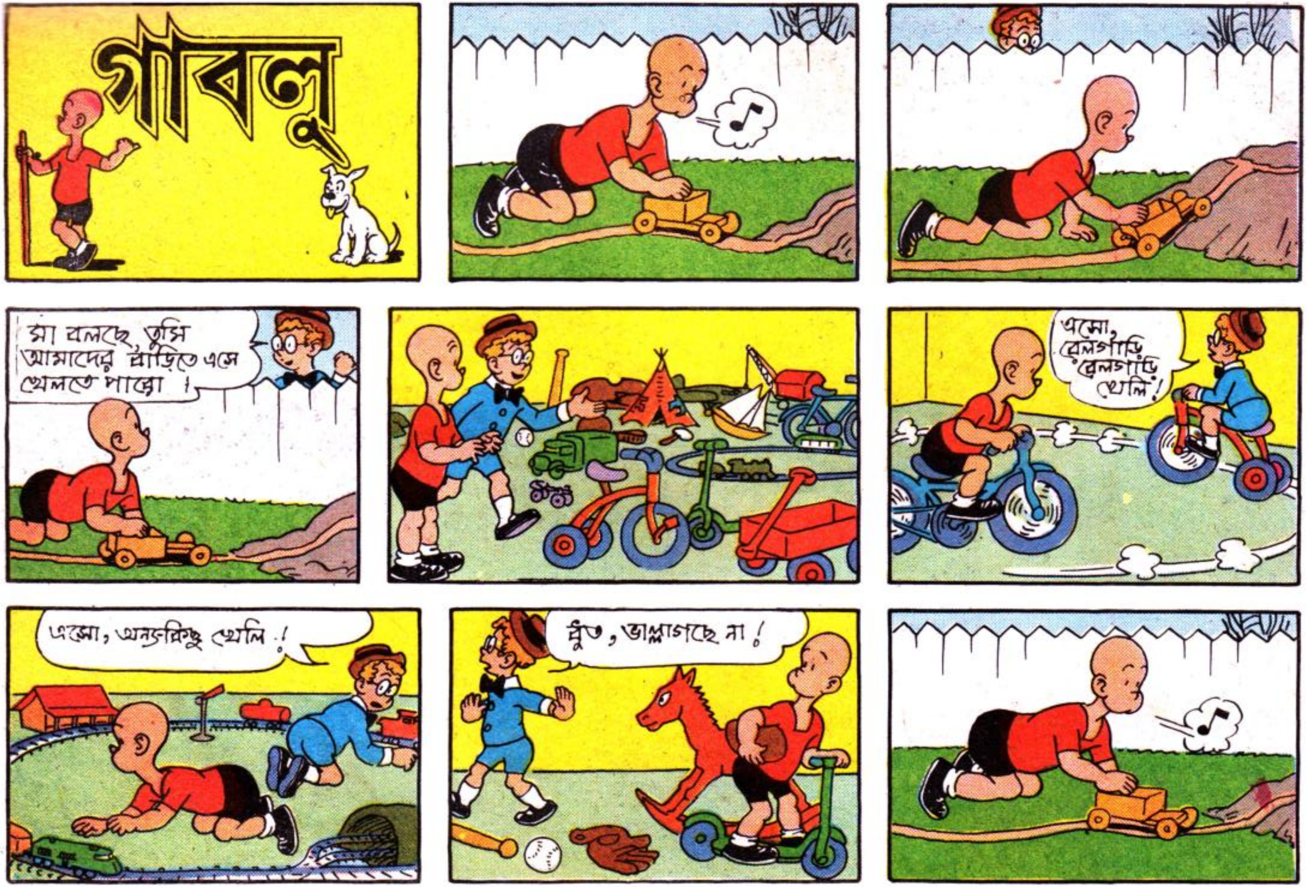
গাবলু
মা বলছে, তুমি আমাদের বাড়িতে এসে খেলতে পারো!
এসো, রেলগাড়ি রেলগাড়ি খেলি!
এসো, অন্যকিছু খেলি!
ধুৎ, ভাল্লাগছে না!

ডিম থেকে পাখি — ৪

দুটো পাখির ওড়ার ভঙ্গির একটা বিশেষ মুহূর্ত নমুনায় দেখানো হল। তোমরা ইচ্ছে করলে এদের উলটো দিকে উড়ে যাবার ভঙ্গিতে অনায়াসে রূপ দিতে পারো।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

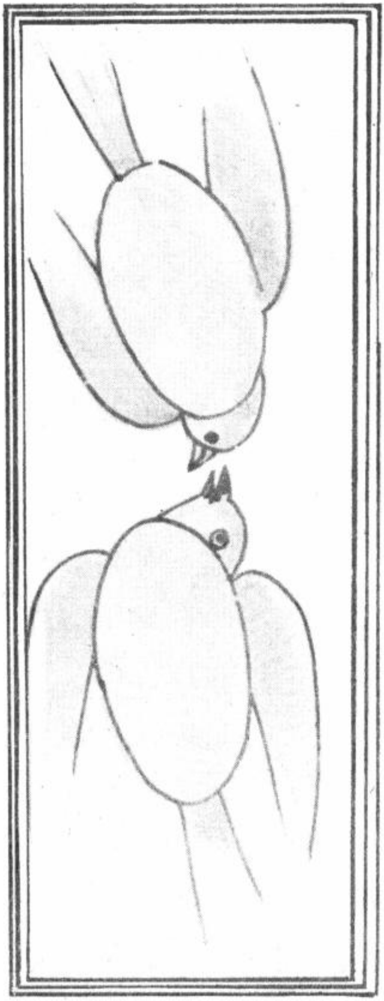

কাগজের ঝোলনা — ৬

নকশায় যা দেখছ এটাই এবারের ঝোলনার আসল চেহারা।

ফুলের পাতাগুলো একটার পর একটা গাঁথতে পারলেই একসময় আপনা থেকে গোল হয়ে বলের মতো মনে হবে। তখন বেশি পাপড়ি থাকলেও গাঁথবে না, তাতে সত্যি-সত্যি ফুলের গোল ভাবটা থাকবে না।

এবার কাজ শেষ হলে একটা লম্বা সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দাও যেখানে তোমার পছন্দ।

মনে রেখো—(১) কাজ শেষ হবার পর কোনো রকম বেশি চাপ লাগলে এর আকার নষ্ট হয়ে যাবে। (২) এই কাজের জন্য খুব পাতলা কাগজ ব্যবহার করলে কাজ নেতিয়ে পড়বে। (৩) এর আকার যেমন ইচ্ছে বড় করতে কোথাও বাধা নেই। (৪) এক-একটা পাপড়ি গাঁথার পর মাঝখানে একটু চাপ দিলে ধীরে-ধীরে ফুলের হালকা ফোটা ভাবটা সুন্দরভাবে দেখা দেবে।

—কারিগর

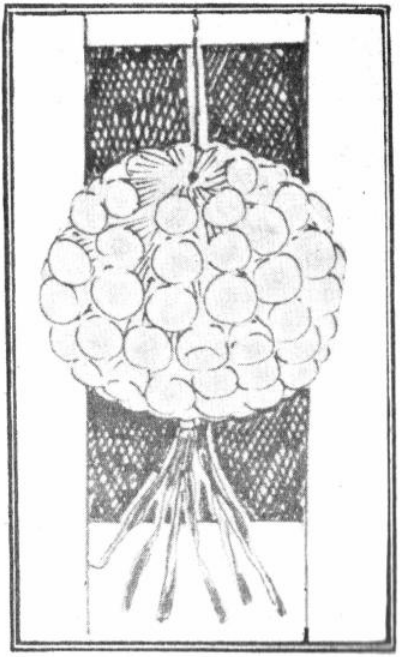

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদা ! রানীপালের সাদা ! সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সুতী, সিন্থেটিক আর ব্লেণ্ডেড-রানীপাল ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই।

নিয়মিত রানীপাল লাগান... আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান

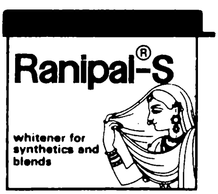

সুতীর কাপড়ের জন্য **রানীপাল ®**
সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়ের
জন্য **রানীপাল ® - এস**

Shilpi SG-2A/78 Ben

Reg No WB/CC/264. MH-BY-SOUTH 683 ANANDAMELA 3 June 1981

লেখাপড়া করতে হলে সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে
আর মস্তিষ্কের কোষগুলোকে রাখতে হবে সক্ষম।
তাই এখন সব ভাল ছাত্রছাত্রীদের প্রিয়

ওয়েসিস

ডাবল এ্যাকশন হেয়ার ফার্টিলাইজার

যেমন চুলের পরিপাটি তেমনি এর সঙ্গে সংযুক্ত
বুদ্ধি প্রদায়িনী উপাদানে মাত্র অল্প দিনেই সকলের
বন্ধু হয়ে গেছে ওয়েসিস!

তুমিও নিশ্চয়ই ওয়েসিসের বন্ধু?

ক্যালকাটা ফিল্মলেট এডভারটাইজিং
কলিকাতা • বম্বে • পাটনা